দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ১৭ জুন, ২০২৪।। ২ আষাঢ়, ১৪৩১
যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com



পর পর তিন বার








CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

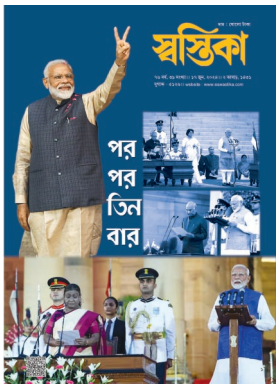
স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ২ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৭ জুন - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

২০২৬ পর্যন্ত জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চায়নি রাজ্যের মানুষ 'শূন্য কলসীর ভকভক আওয়াজ' ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

রেখেছ বাঙ্গালি করে মানুষ করনি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

এবার কেঁপে উঠলো, ইসলামাবাদ ☐ অরবিন্দ ☐ ৯

তৃতীয়বারেও ক্ষমতাসীন হলেন নরেন্দ্র মোদী ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ১১

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ জোট তৃতীয়বার দেশের শাসন ক্ষমতায় ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১৩

আবার একবার মোদী সরকার ☐ প্রদীপ মারিক ☐ ১৭

গণতন্ত্রের উৎসব তো হলো, এবার একটু মূল্যায়ন ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১৮

ইতিহাস গড়ে টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করলেন নরেন্দ্র মোদী ☐ ২৩

২০২৪ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলের বিভিন্ন দিক ☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৪

২০২৪ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল একনজরে ☐ ২৬

স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও 'শিবাজী উৎসব' ☐ ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য ☐ ৩১

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনে সমর্থ স্বামী রামদাসের প্রভাব ☐ দীপক খাঁ ☐ ৩৪

পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বিশে জুন ☐ প্রণব দত্ত মজুমদার ☐ ৩৬

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আশানুরূপ ফল না হওয়ার কিছু কারণ ☐ অমলেশ মিশ্র ☐ ৪৬

মোদীর তৃতীয়বারের জন্য ঐতিহাসিক শপথ : অবসান ইন্ডি জোটের ক্ষমতার স্বপ্ন দেখা ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ৪৭

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বেনজির, মোশারফ বা রাগীব আলিতে পরিপূর্ণ ☐ শিতাংশু গুহ ☐ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ খেলা : ৪৩-৪৪ ☐ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৬ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

প্রকাশিত হবে
২৪ জুন,
২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৪ জুন,
২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় যোগের বিশ্বায়ন

ভারতবর্ষ বিশ্বকে অনেক কিছুই দিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো ভারতীয় যোগ। মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার এটি অন্যতম প্রক্রিয়া। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাবানুসারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০১৪ সালের ২১ জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে এবং সারা বিশ্বে যোগের আয়োজন হয়। আজ বিশ্বে যোগের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভারতীয় যোগের ওপর আলোকপাত করবেন কয়েকজন যোগ বিশেষজ্ঞ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সম্পাদকীয়

তৃতীয়বার নরেন্দ্র মোদী

নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়রের জন্য প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিশানির্দেশ। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যেইভাবে বিগত দশ বৎসর দেশের উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহা দেশের ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন নেতাগণ কোনোভাবেই মানিয়া লইতে পারিতেছেন নাই। ভারতীয় জনতা পার্টি তথা নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি জোটবদ্ধ হইয়া নির্বাচনে লড়িয়াছে। দেশের মুসলমানদিগের মনে অহেতুক ভীতি সঞ্চার করিয়াছে। তাহার উপর ভারতবিরোধী শক্তিগুলিও সক্রিয় হইয়া নানাভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করিয়াছে। কীরূপ প্রভাবিত করিয়াছে তাহার একটি প্রমাণ হইল উত্তরপ্রদেশের একটি ভোটকেন্দ্র যাহার সমস্ত ভোটারই হইল মুসলমান। কেন্দ্রীয় সরকার সেই ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি পরিবারে কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা ঘর, শৌচাগার, রান্নার গ্যাস, নলবাহিত জল— সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু কী দুর্দৈব, সেই ভোটকেন্দ্রে একটিও ভোট বিজেপির ঝুলিতে পড়ে নাই। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি স্লোগান তুলিয়াছিল এইবার চারশতের অধিক আসন জয় করিতে হইবে। এইহেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাহারা সেই লক্ষ্য পূরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু বিরোধীরা যত আসন পাইয়াছে, বিজেপি একা তাহার অধিক আসনে জয়লাভ করিয়াছে। এনডিএ জোট হিসাবে তিনশতর কাছাকাছি আসন লাভ করিয়াছে। সাংবিধানিক রীতি অনুসারে মহামহিম রাষ্ট্রপতি এনডিএ জোটের সংসদীয় নেতা নরেন্দ্র মোদীকেই সরকার গঠনের অনুমতি দিয়াছেন। সেই অনুসারে গত ৯ জুন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী রূপে নরেন্দ্র মোদী শপথ গহণ করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, ইহাতে বিরোধী দলের নেতাদের বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাত্রদাহ শুরু হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, নরেন্দ্র মোদীর পরাজয় হইয়াছে, তাঁহার সরকার গঠনের অধিকার নাই। রাষ্ট্রপতি মহোদয়া নরেন্দ্র মোদীকে সরকার গঠনের অনুমতি প্রদানের পরও বলিয়াছেন, এই সরকার অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক, এই সরকারকে তিনি মানিবেন না। কী হাস্যকর প্রলাপ! কংগ্রেস দল শতকেরও ঘরেও প্রবেশ করিতে পারে নাই আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯টি আসনে জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা লইয়া তাহারা সরকার গঠন করিবেন! আসলে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা ভারতের রাজনীতিতে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছে। দেশের কল্যাণের চিন্তা তাহাদের মাথায় নাই। তাই তাহাদের সমস্ত বাচন ও আচারআচরণ ঘৃণা ও বিদ্বেষপ্রসূত। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সকলের শীর্ষে অবস্থান করিতেছেন। নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া দেশের কোনো রাজ্যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গ। এইখানে সমস্ত প্রকার হিংসা শুধু নহে, প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। আর তাহা শাসকদলের মদতে। দীর্ঘ বাম শাসনেও তাহা হইয়াছে। এইবারের নির্বাচনেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। সমগ্র দেশ দেখিতেছে ভোট পরবর্তী হিংসায় মাতিয়াছে শাসকদলের গুন্ডাবাহিনী। তাহা প্রশমনে নেত্রীর মুখে কোনো বাক্য নাই। সন্দেশখালির মানুষ ভয়ে কাঁপিতেছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাদের কী হইবে!

এই কথা সত্য যে, নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির আশানুরূপ ফল না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে কর্মী-সমর্থকরা কিছুটা মুহ্যমান হইয়াছেন। তাহাদের ভাবিতে হইবে, এত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাহারা ১২টি আসনে জয়লাভ করিয়াছে। সার্বিকভাবে বিজেপিরই জয় হইয়াছে, বিরোধীদের নহে। ওড়িশায় পাঁচবারের সরকারে অধিষ্ঠিত বিজেডি দলকে পরাজিত করিয়া বিধানসভা দখল করিয়াছে বিজেপি। অরুণাচলেও বিধানসভা দখল করিয়াছে। দক্ষিণে চারটি রাজ্যেই খাতা খুলিয়াছে। বিরোধীরা হিন্দু জনমানসে ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে যে, অযোধ্যায় বিজেপি পর্যুদস্ত হইয়াছে। ইহা একটি মিথ্যা ন্যারেটিভ। অযোধ্যা লোকসভা কেন্দ্র নহে, ফৈজাবাদ লোকসভার অন্তর্গত একটি বিধানসভা কেন্দ্র। অযোধ্যা বিধানসভায় বিজেপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রবাদী মানুষদিগকে এই মিথ্যা ন্যারেটিভের ভ্রমজাল ছিন্ন করিতে হইবে। পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়াই এনডিএ কেন্দ্রে সরকার গঠন করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাংগঠনিক ভুলভ্রান্তির নিরসন ঘটাইয়া যথারীতি দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবেন, ইহা সমস্ত দেশভক্ত মানুষের বিশ্বাস।

সুভাষিতম্

হর্তৃর্ন গোচরং যাতি দত্তা ভবতি বিস্তৃতা।
কল্পান্তেঽপি ন যা নশ্যেৎ কিমন্যদ্বিদ্যয়া বিনা।।

চোর যাকে দেখতে পায় না, দান করলে যা বিস্তার লাভ করে, প্রলয়কালেও যার বিনাশ হয় না, বিদ্যা ছাড়া তা আর কোন জিনিস হতে পারে?

২০২৬ পর্যন্ত জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চাননি রাজ্যের মানুষ

‘শূন্য কলসীর ভক ভক আওয়াজ’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বাম-কংগ্রেসের সরে যাওয়া আড়াই শতাংশ ভোট আর দু’বছরের সম্ভাব্য সন্ত্রাসের কথা ভেবেই রাজ্যের মানুষ বিজেপির থেকে মমতাকে এগিয়ে দিয়েছেন। মূলত সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য বিজেপি ৬ আসন আর আনুমানিক ১.৫ শতাংশ ভোট হারিয়েছে। তার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে নেতাদের ক্লৈব্য আর দৃষ্টিকটু অন্তর্দলাদলির কারণ। ভোটের পরেও যার রেশ চলেছে। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর হারিয়ে যাওয়া নেতা থেকে শুরু করে, অচেনা-অজানা আর চমক দেওয়া প্রার্থী চয়নের ফলে বিজেপিকে বড়ো রকমের খেসারত দিতে হয়েছে। তাছাড়া চার বছর পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো গ্রহণযোগ্য আর জোরদার মুখ না থাকায় আশানুরূপ ফল করতে পারেনি বিজেপি নেতৃত্ব। ২০১৯-এর পর তিনটি নির্বাচনের দু’টিতে ল্যাজেগোবরে হতে হয়েছে বিজেপিকে। ২০২৬-এর ভোট এই রাজ্যে বিজেপির শেষ অগ্নিপরীক্ষা।

পর্যালোচনা বলছে, বাম আর কংগ্রেসের দয়ায় মমতা ১৪ আসনে বিজেপিকে হারাতে পেরেছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভোট নয়, ভয়-ভীতি থেকেই তৃণমূলকে জিতিয়েছে রাজ্যের মানুষ। আরও দু’বছর ২০২৬ পর্যন্ত মমতার সঙ্গে ঘর করতে হবে এই ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে তারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চায়নি রাজ্যের মানুষ। ভোট বৃদ্ধির হার তার প্রমাণ। ২০১৯-এর বিগত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে মাত্র আড়াই শতাংশ ভোট বেড়েছে তৃণমূলের আর দেড় শতাংশ কমেছে বিজেপির। সারা দেশে ৬৪ কোটি ভোটের ভিতর তৃণমূল পেয়েছে ২.৫ কোটির কিছু বেশি আর বিজেপি ২৪ কোটি ভোট। শতাংশের হিসেবে তৃণমূলের ২ আর বিজেপি ৩৭। শৃগালের সঙ্গে সিংহের তুলনা হয় না আর শূন্য কলসী ভকভক করে। তৃণমূলের ভোট বৃদ্ধি বাম-কংগ্রেসের জন্য। মমতার ভাতা বা সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি তার ভোটব্যাংককে কেবল সুরক্ষিত করছে।

ডোল বনাম দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে জিতেছে দুর্নীতি। বাম- কংগ্রেসের সরে যাওয়া ভোট তার সঙ্গী। ভোটাররা মনে করেছে বিজেপিকে আটকাতে নিজেদের দলের থেকে তৃণমূল শক্তিশালী। যদিও ২০২১-এর বিধানসভার নিরিখে মমতার ভোট কমেছে আর বিজেপির ভোট বেড়েছে। বাম আর কংগ্রেসের ভাঁড়ার শূন্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। বামেদের ৩০ প্রার্থীর ভিতর ২৮ জনের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বিজেপির দেড় শতাংশ ভোট কমা কোনো হতাশার চিত্র নয়। তৃণমূলের জয় অনেকটাই ভীতি সঞ্জাত। দুর্বল সংগঠন আর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কম থাকায় বিজেপি নেতারা তা কাটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে মানুষ সরে গিয়েছে।

মমতার দুর্বলতা যেমন নিছক দুর্নীতি নয়, তাঁর সবলতাও শুধু ভাতা দান নয়। কেবল এ রাজ্যের ক্ষেত্রে হয়তো আরও কিছু রয়েছে যা রহস্যাবৃত। সে জাল কাটতে না পারলে বিজেপি এ রাজ্যে কোনোদিন এগোতে পারবে না।

তাই এখনই বলা যাবে না তৃণমূলের জয় মানুষের জয়। লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন মমতা। এখন বিজেপির প্রধান মুখ শুভেন্দু অধিকারী তখন ছিলেন মমতার প্রধানতম সেনানী। ২০২১-এর রাজ্য ভোটে শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে একমুখী লড়াইয়ে পরাজিত হন মমতা। সেই শ্লাঘাই শুভেন্দুবাবুকে আগামীদিনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পরাজয়ের নেপথ্যে নিজেদের দোষ দেখাটাই বোধহয় বিজেপি নেতাদের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গল। তাদের বোঝা প্রয়োজন যে, মমতার দুর্বলতা যেমন নিছক দুর্নীতি নয়, তাঁর সবলতাও শুধু ভাতা দান নয়। কেবল এ রাজ্যের ক্ষেত্রে হয়তো আরও কিছু রয়েছে যা রহস্যাবৃত। সে জাল কাটতে না পারলে বিজেপি এ রাজ্যে কোনোদিন এগোতে পারবে না।

মানুষ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে এটা দৃশ্যমান হলে সে রহস্য জাল কাটা সম্ভব। আগেই বলেছি, এখন মমতার যথার্থ কোনো বদলি মুখ বিজেপিতে নেই। তাই প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা এই খামতিটা কেন বাঁচিয়ে রাখছেন। রাজ্যের মানুষকে কেনই-বা তা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন আর বারবার সেই ফয়দা তুলছেন সুচতুর মমতা। মমতার বদলি মুখ এলে বা তার পালটা নেতৃত্ব এলে সে জাল হয়তো কাটবে। বিজেপির দুর্বল সংগঠন চাঙ্গা হবে। হেরো, পলাতক আর অযোগ্য প্রার্থীদের বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গের দল হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে বিজেপি। তবে এসব কেবলই ‘হবে হয়তো’। আসলটা এখন দেখার। তার জন্য ২০২৬ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ■

রেখেছ বাঙ্গালি করে, হিন্দু করনি

বিজয়েষু দিদি,

ভোট পর্ব শেষ। বিপুল জয়ের অভিনন্দন। ২২ থেকে ২৯ হওয়া বড়ো জয় বই কী! তবে দিদি, এবারের ভোট অনেক কিছু শিখিয়ে দিল। পাঁচবছর আগে আপনি শুধু দুধেল গাইদের দয়া পেয়েছিলেন। নিজেই মেনে নিয়েছিলেন সেকথা। আর এই পাঁচবছরে আপনি আরও কিছু মানুষকে 'দুধের গাই' বানিয়ে ফেলেছেন। সরাসরি বলতে গেলে, কিনে নিয়েছেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই কিনেছেন।

ভোটের যা ফল তাতে আপনার আসন সংখ্যা বাড়ার আনন্দ থাকলেও চোরাস্রোতও আপনি টের পেয়েছেন। অনেক জায়গাতে আপনি অল্পের জন্য জিতেছেন বা হেরেছেন। নানারকম বিশ্লেষণ রয়েছে। তবে আমার মনে হয়েছে এক অন্য কথা। সেটা স্পষ্ট করে বলে দিই দিদি। আপনি কোনো দেশপ্রেমিক বাঙ্গালির ভোট পাননি। স্বার্থসর্বস্ব মানুষের ভোটেই আপনার দলের এক নম্বর হওয়া। এখানেই হিসাবের ভুল হয়েছে বাকিদের ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট যে প্রায় সবটাই আপনার ঝুলিতে যাবে সেটা ঠিকই ছিল। পেয়েছেনও। সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ বহরমপুরে গুজরাটের বাসিন্দা প্রাক্তন ক্রিকেটারের জয়। এটা মানতে হবে যে আপনার ভাইপোর আসন ডায়মন্ড হারবার ছাড়া এবার কোথাও সেভাবে বড়ো আকারে রিগিং হয়নি ভোটে। সন্ত্রাস কম-বেশি সব আসনে থাকলেও চুরির মাত্রা খুবই কম ছিল।

আগের তুলনায় আপনার দলের ভোট কমেছে। আগের তুলনায় অনেক কম বিধানসভা আসনে আপনার দল এগিয়ে রয়েছে। রাজ্যে পুর এলাকার বেশিরভাগ জায়গাতেই আপনার চেয়ে বিজেপি ভোট বেশি পেয়েছে। কলকাতা পুরসভা এলাকাতেও অনেক ওয়ার্ডে সেই ছবি। এই যে দিদি, আপনার শহরাঞ্চলে পিছিয়ে থাকা বুঝিয়ে দেয় দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন মানুষ আপনাকে ভোট দেয়নি। প্রায় ৪০ শতাংশ দেশপ্রেমিকের ভোট বিজেপি পেয়েছে। আর আপনার চিরন্তন 'দুধেল গাই' এবং গত পাঁচবছরে কেনা গাইদের ভোটেই আপনার দলের হম্বিতম্বি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বার দেশ চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে দেশের মানুষ। কিন্তু আমার ব্যাখ্যায় উনি যা বলেছেন তার মর্যাদা দিতে পারেনি যারা, তারাই আপনাকে জিতিয়েছে। এবং এই অংশটা এখনও পর্যন্ত স্বার্থসর্বস্ব বাঙ্গালি রয়ে গিয়েছে। মোদী বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সারা বিশ্বে ভারতের এখন যে গৌরবজনক স্থান তা আরও উন্নত করার কথা বলেছেন। ব্যক্তি-সুবিধার চেয়ে দেশের অর্থনীতিকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। সকলের জন্য পাকাবাড়ি, সব বাড়িতে পানীয় জল, সবার জন্য সুলভ বিদ্যুৎ, পরিবেশ রক্ষা, দেশজুড়ে আধুনিক পরিকাঠামো, সড়ক-রেল-বন্দর গড়ে তোলার কথা বলেছেন। যার মধ্যে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেশ সেই রায়ই দিয়েছে। তবে সেই রায়ে কিছুটা চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে মোদীর জন্য। স্বপ্নের ভারত গড়ার কাজে অনেকের সহমতের বাধ্যবাধকতা রয়ে গিয়েছে। এবং সেই সহযোগীদের মধ্যে স্বার্থভাবনা নেই বা আগামীতে প্রকট হবে না সেটা বলা যাবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পারত। এই ক্ষতিপূরণে দেশের পাশে। গত দশবছরে যে গতিতে ভারত এগিয়েছে, চাঁদে পৌঁছেছে, বিশ্বকে কাছে টেনেছে, অর্থনীতি-সহ সর্বক্ষেত্রে যে দ্রুততায় অগ্রগতি হয়েছে, কাশ্মীরকে শান্ত করা গিয়েছে, সেই রকম সাফল্য আগামী পাঁচবছর ধরে রাখা সত্যিই চ্যালেঞ্জের হয়ে গিয়েছে। তবু দেশবাসীর ভরসা রয়েছে মোদীর উপরে।

হাজার টাকায় কেনা মায়েরা বুঝতেও পারছেন যে তাদের সন্তানদের জন্য কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে? আপনি এদের চিনতেন। এবার শুধু ভয় দেখিয়ে দিলেন যে, আপনার দল না জিতলে ওই টাকাটা পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

দিদি, মোদী যখন এমন সব দেশপ্রেমের কথা বলছিলেন তখন আপনি একভাবে পকেট ভরার কথা বলে গিয়েছেন। সেটাও হাজার-বারোশো টাকা। সংসার পিছু বছরে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা নগদ সুবিধা। আর তার পরিণতিতে তারা আপনার কেনা 'গাই' হয়ে গিয়েছেন। ছেলে মদ্যপ হলেও মা কিছু বলেননি, কারণ সেই মদের আয় থেকেই মায়ের খুঁটে হাজার টাকা আসবে। স্ত্রীর টাকা আসবে বলে স্বামী মেনে নিয়েছেন যত সব দুর্নীতিকে। ছেলে কাজ না পেয়ে অন্য রাজ্যে চলে গেলেও হাত পেতে টাকা নিতে হাত কাঁপেনি যাদের,

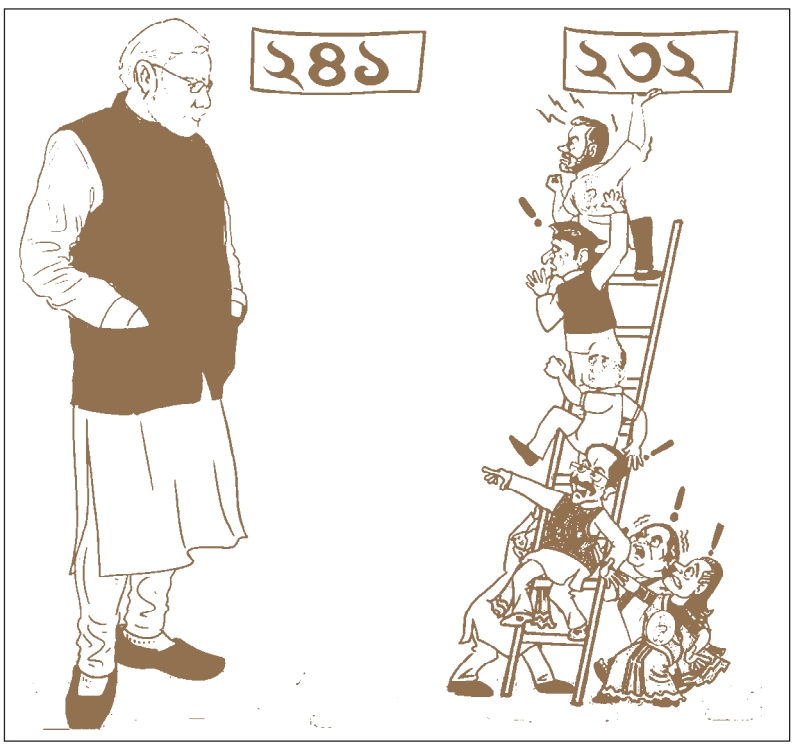
তারাই দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছেন আপনাকে।

এই ভোটে আপনি যেসব হিন্দু আধ্যাত্মিক সংস্থার নামে কুকথা বলেছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করেছেন, তাতেও তাঁদের কিছু যায় আসেনি। যিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে ভোগ খেতে যান, বেড়াতে গিয়ে তীর্থস্থানে আশ্রমে ঘর নেন, বন্যায় সেবা নেন, তিনিও কিন্তু হাজার টাকায় নিজের জাতিসত্তা বিক্রি করে দিয়েছেন। বেলুড় মঠে গিয়ে যাঁরা হাত জোড় করে বসে থাকেন, ভোগের লাইনে দাঁড়ান, তাঁদের গায়ে লাগেনি রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে আপনার খারাপ কথা। মায়াপুর ইসকন মন্দির যাঁদের কাছে বার্ষিক পিকনিকের জায়গা তাঁদের কথা আমি ধরছিই না দিদি। সন্ন্যাসীদের গাল দিয়ে আপনি যখন মুসলমান ভোট এককাট্টা করছিলেন, তখন এরা ছিঃ ছিঃ করেছেন হয়তো। কিন্তু পকেটের কথা ভেবে ভোটও দিয়েছেন আপনাকে। এরা সকলেই পার্থ-বান্ধবীর বাড়িতে টাকা গোনার দিনে রাত জেগে টিভি দেখেছেন, জ্যোতিপ্রিয়র গ্রেপ্তার, জীবনকৃষ্ণের মোবাইল ফোন পুকুরে ফেলা দেখেছেন। হাইকোর্টের রায় শুনেছেন। হাজার হাজার চাকরি বিক্রির নিন্দাও করেছেন, কিন্তু ভোটটি দেওয়ার সময় ভেবেছেন– কার ছেলে চাকরি পেল না, কোন সন্ন্যাসীর অপমান হলো, কে দুর্নীতি করেছে, তা ভেবে আমার লাভ নেই। আমি তো হাজার টাকা পাচ্ছি! আপনার এই ভোটাররা কয়লা, গোরুপাচারের কথা জানেন, সব দপ্তরে চুরির কথা জানেন, আপনাকে দোষীও মনে করেন, কিন্তু তার চেয়েও হাজার টাকাকে বেশি ভালোবাসেন। গত দশবছরে ভারতের উন্নতির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করেন, রান্নাঘরে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস, বাড়িতে শৌচাগার, বন্দেভারত ট্রেন, কাছের স্টেশনে আধুনিক সুবিধা পান। সঙ্গে নিজের জন্য হাজার টাকাও চান। এরা জানেন, মোদীর দেওয়া সুবিধা তো সবার জন্য। সবাই পাবে। কিন্তু দিদিকে ভোট না দিলে মাসিক হাজার টাকা আর মিলবে না। তাই নিজের ভেতরের সব বিদ্রোহী সত্তা, দেশপ্রেম উধাও হয়ে যায় হাজার টাকার স্বপ্নে।

আসলে দিদি, আপনি এইসব বাঙ্গালিকে ভালো করে চেনেন। তাই গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল, তখন এই টোপটা দিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই কেল্লাফতে। হাজার টাকায় কেনা মায়েরা বুঝতেও পারছেন যে তাদের সন্তানদের জন্য কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে? আপনি এদের চিনতেন। এবার শুধু ভয় দেখিয়ে দিলেন যে, আপনার দল না জিতলে ওই টাকাটা পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

মোদীর তো 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। আর দিদি, আপনার স্রেফ 'আপকা বিকাশ, পরিবারকা বিকাশ' স্লোগান। কেন্দ্রের সুবিধা তো ফ্রি। আর দিদির টাকা এক্সট্রা। আর আসলের থেকে বাড়তিই বেশি টানে। তখন কেউ ভাবেন না, নিজের টাকাই দিদির টাকা হয়ে আপনার অ্যাকাউন্টে ঢোকে।

দিদি, আপনার এই কেনা ভোটার, বিশেষ করে মায়েদের আমার প্রণাম জানাবেন। □



বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

এবার কেঁপে উঠলো ইসলামাবাদ

পিওজেকের ওপর ব্যাপক গণবিক্ষোভের মেঘ ধূমায়িত হওয়া ভবিষ্যতে এক বৃহত্তর বিস্ফোরণের ইঙ্গিত।

বাস্তবতাকে নস্যাৎ করে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র উপস্থাপনে পারদর্শী এবং রাজনৈতিক-কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের 'আইএসআই' নামক গোয়েন্দা এজেন্সি এবার কার্যত একটি আত্মঘাতী গোল করে ফেলেছে। এই যাত্রায় পরপর দু'খানা শক তারা খেয়েছে। পাক-অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে (পিওজেকে) ক্রমাগত ঘটে চলা ধরনা-বিক্ষোভ পিওজেকের গণ্ডী ছাড়িয়ে এবার ইসলামাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, গত মে মাসের মাঝামাঝি পিওজেকে জুড়ে পাক সেনার বিরুদ্ধে সংঘটিত গণবিক্ষোভের প্রত্যুত্তরে পাকসেনার মদতে পালটা মিছিল ও র‍্যালি আয়োজনের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হওয়া।

পাকসেনার অত্যাচার-নির্যাতন এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ পিওজেকে জুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক লুঠতন্ত্রের বিরুদ্ধে বহু দিন ধরেই স্থানীয় জনমানসে রাগ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেলে বিদ্যুৎ ও আটার অগ্নিমূল্যের বিরুদ্ধে মে মাসের মাঝামাঝি বড়ো মাপের বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো স্থানীয়রা। নিজস্ব কায়দায় এই বিক্ষোভ-আন্দোলন দমনে এবারও পাকিস্তান সেনাশক্তি প্রয়োগেই ভরসা রাখলো এবং এর পরিণামে এই আন্দোলন চলাকালীন পিওজেকের অনেক জায়গায় ঘটে চললো নানান হিংসাত্মক ঘটনা। বহু মানুষ প্রাণ হারালো।



উলটে গেল বাজি, পালটে গেল চাল : জোর-জবরদস্তি, নির্যাতন ও রাজনৈতিক চাল প্রয়োগে সব সমস্যার সমাধানের পাকিস্তানি কৌশলের পরিণাম এইবার হলো উলটো। পাকিস্তান ভেঙে 'বাংলাদেশ' গঠিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকায় যে কোনো বিক্ষোভ-আন্দোলনকে ভয় পায় পাকিস্তানি প্রশাসন। সম্ভবত এই কারণেই গত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পিওজেকেতে আন্দোলন যখন দানা বাঁধছিল, তখন সেই সংক্রান্ত খবর চেপে রাখার উদ্দেশ্যে পাক প্রশাসন দু'রকমের রণকৌশল নেয়। প্রথম পর্যায়ে জনতাকে সংগঠিত করে চলা আন্দোলনের নেতৃত্বকে জনসমক্ষ থেকে উধাও করে দেওয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ে, পাকসেনার অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিবাদ-আন্দোলনের পালটা জবাবে পাক সেনার সমর্থনে পুরো পিওজেকে জুড়ে মিছিল ও র‍্যালি বের করা। জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পিওজেকের বাগ এলাকার বাসিন্দা কবি ও সাংবাদিক আহমেদ ফরহাদ শাহ ছিলেন এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং স্বাভাবিকভাবেই পাক প্রশাসনের চক্ষুশূল। গত ৩৮ বছর ধরে পিওজেকেতে পাকিস্তানি সেনার জোরজুলুম এবং সেখানে প্রতিনিয়ত চলা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরব ও প্রতিবাদ-মুখর ছিলেন ফরহাদ। তিনি প্রশাসনের টার্গেট হয়ে গেলে তার ফল হলো উলটো। পাক প্রশাসনের এই পদক্ষেপ প্রকারান্তরে গেল তাদেরই বিপক্ষে। ফরহাদের উধাও হওয়ার পালট প্রতিক্রিয়ায় পিওজেকে জুড়ে চলা প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আগুনে যেন ঘি পড়লো। ব্যাপকতর রূপ ধারণ করে জনতার মিছিল এবং এই আন্দোলন এবার পৌঁছে গেল ইসলামাবাদ।

ফরহাদ শাহের গায়ে হাত দেওয়ার মূল্য : ফরহাদ শাহের স্ত্রী সাইদা উরুজ জয়নাবের বক্তব্য অনুযায়ী— ১৪-১৫ মে'র মধ্যরাত্রে তাদের ইসলামাবাদের বাড়ির সামনে থেকে চারজন লোক ফরহাদ শাহকে অপহরণ করে। একটি বড়ো গাড়িতে ফরহাদকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অপহরণকারীরা ৪টি গাড়িতে চেপে এসেছিল। ব্যক্তিগত আলোচনায় জয়নাবকে ফরহাদ অনেক বার তার ওপরে ঘনিয়ে ওঠা বিপদ এবং তার প্রাণসংশয়ের ব্যাপারে বলেছিলেন। এই কারণে ফরহাদ শাহের অপহরণের পরেই ইসলামাবাদ হাইকোর্টে জয়নাব একটি মামলা দায়ের করে সেই আবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে পাক ফৌজ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্যই ফরহাদ শাহকে অপহরণ করেছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই।

মধ্যরাতে ফরহাদ শাহের অপহরণের ঘটনার পরেই গত ১৫ মে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানান জয়নাব। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সেই দিনই বেলা ৩টের মধ্যে পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জবাব তলব করে আদালত। এর জবাবে আদালতকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের তরফে জানানো হয় যে আইএসআইয়ের হেফাজতে নেই ফরহাদ শাহ। সরকারি তরফে এই উত্তর পাওয়ার পর পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেল (এজিপি) মনসুর উসমান আওয়ানকে বিচারক চার দিনের মধ্যে ফরহাদ শাহকে খুঁজে বের করার আদেশ দেন এবং পরিষ্কার বলেন যে শাহকে খুঁজে বের করার যাবতীয় দায়িত্ব বর্তাবে অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপরেই। এর সঙ্গে পাক আদালত আইএসআই ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স (সেনা গোয়েন্দা বিভাগ)-এর সেক্টর কমান্ডার, পাক ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর নির্দেশক, আইন মন্ত্রী আজম নাজির তারার-সহ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, আইন ও অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের সচিবদের ২৯ মে পরবর্তী শুনানির তারিখে

আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। আদালতের এই শক্ত পদক্ষেপের পর চাপের মুখে পড়ে এজিপি আওয়ান গত ২৯ মে আদালতকে জানান যে ফরহাদ শাহ রয়েছেন পুলিশ হেফাজতে। সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধাদানের অপরাধে কোহালা চেকপোস্টের তরফে ফরহাদ শাহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য অনুযায়ী— কোহালা চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শওকতের অভিযোগের ভিত্তিতে শাহের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করা হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আইএসআই তথা পাক সেনা এই ক্ষেত্রে সেটাই করেছে যেটা বালুচিস্তানে তারা অহরহ করে অভ্যস্ত। কিন্তু কোনো মামলা অন্যরকম মোড় নিলে সেই কঠিন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নিজেদের বাঁচাতে স্থানীয় পুলিশকে সামনে এনে নিজেদের দায় দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতেও তারা ওস্তাদ! ফরহাদ শাহ ভাগ্যবান যে তার অপহরণের পর একটুও সময় নষ্ট না করে তাঁর স্ত্রী হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। যার ফলে এখনও পর্যন্ত শাহের ঠিক ঠাক ভাবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অটুট রয়েছে। ২৯ মে-র দিনই মুজফফরাবাদ সদর থানায় তার পরিবারের সঙ্গে ফরহাদ শাহের সাক্ষাৎ হয়।

বিক্ষোভ-আন্দোলনের বহর বৃদ্ধি : ফরহাদ শাহ অপহরণ মামলায় পাক সেনা ও আইএসআই আপাতত হাত ধুয়ে ফেললেও, এই মামলার গভীর প্রভাব পড়লো পিওজেকেতে। এই মামলার প্রভাবে পিওজেকেতে চলতে থাকা আন্দোলন ইসলামাবাদে পৌঁছে গেল। ফরহাদ শাহের মুক্তির দাবিতে গত ২৮ মে ইসলামাবাদে বড়ো মাপের আন্দোলন হয়। ফরহাদের মা-সহ তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এই আন্দোলনে অংশ নেন। ফরহাদ শাহের মায়ের চোখের জল বাঁধ মানছিল না, রুদ্ধ হয়ে আসছিল কণ্ঠ। ক্ষীণ স্বরেই তিনি অনবরত তাঁর পুত্রের মুক্তির দাবি জানিয়ে যাচ্ছিলেন। এর আগেও যারা নিখোঁজ হয়েছিলেন, এখনও পর্যন্ত যাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার কোনো খবর নেই— তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়রাও এই আন্দোলনে যোগ দেন। মানবাধিকার সংগঠনের যুক্ত লোকজনও এই আন্দোলনে শামিল হন। পিওজেকেতে সংঘটিত প্রতিবাদ- আন্দোলনের প্রচার দেশে-বিদেশে রোখার চেষ্টায় মরিয়া পাক-প্রশাসনের যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হলো। যা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিল পাক প্রশাসন, তার থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের রেহাই মিলল না।

মারীর ভারপ্রাপ্ত সেনা কমান্ডারের ভূমিকা : পিওজেকেতে হালফিলে সংঘটিত বিক্ষোভ-আন্দোলন দমনে মুজফফরাবাদ-সহ বিভিন্ন স্থানে সেনার সমর্থনে মিছিল ও র‍্যালি বের করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাক পঞ্জাবের মারীতে মোতায়েন ও অবস্থানরত ১২-ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের টু-স্টার (দুটি তারকা বিশিষ্ট) কমান্ডার পিওজেকে বিষয়ক সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। পিওজেকে প্রশাসনে মারীতে অবস্থানরত পাক সেনার এই ডিভিশনটির এতটাই প্রভাব যে কোনো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে মারীর কমান্ডার পিওজেকের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সমেত প্রশাসনিক আধিকারিকদের সোজাসুজি তলব করে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর এপ্রিলে সর্দার তনবির ইলিয়াসের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে পাকসেনা চৌধুরী আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে সরকারকে পিওজেকের ক্ষমতায় আনে, যে সরকারটি হলো পাকসেনার হাতের পুতুল। মারীর সেনা কমান্ডারের নির্দেশ পালনে তনবির ইলিয়াস অস্বীকৃত ও অসম্মত হওয়ার কারণে ক্ষমতা থেকে তনবিরকে সরানো হয়।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর বা পিওজেকেতে গত ২৭ মে সরকার-বিরোধী প্রস্তাবনা নস্যাৎ করার ছকও মারীতে তৈরি হয়। গত ১১ থেকে ১৪ মে-র মধ্যে যার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ১১-১৪ মে-র মধ্যে বিক্ষোভ- আন্দোলনে যোগ দেওয়া এবং নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করা ব্যক্তিদের হেফাজতে নেওয়ার সঙ্গে ২৬ মে পিওজেকে জুড়ে পাকসেনার সমর্থনে র‍্যালি বের করার পরিকল্পনা করা হয়। বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ওই পরিকল্পনা রূপায়ণে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (পিপিপি) এবং অল জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের মতো রাজনৈতিক দলগুলিকে মারীতে তলব করাও হয়েছিল। পাকসেনার হাতের ক্রীড়নক পিওজেকেতে ক্ষমতাসীন সরকারের অংশীদার এই দুটি দল।

এদেরকে মারীতে ডেকে কোহালা থেকে মুজফফরাবাদ পর্যন্ত একটি বড়ো র‍্যালি বের করার ছক করা হয়। পাক পঞ্জাবের মারী ও পিওজেকের মধ্যে দূরত্ব মেরেকেটে ৩০ কিলোমিটার। সেনার সমর্থনে বের হতে চলা এই র‍্যালিতে গাড়ি জোগাড় থেকে লোক আনা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে মারীতে মোতায়েন থাকা পাকসেনার ১২-ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্রচুর গাড়িঘোড়া সংবলিত হওয়ার কারণে এই র‍্যালি কিছুটা সাফল্যও পায়। চার চাকার গাড়ি, বাস ও মোটরসাইকেলে সওয়ার হয়ে কয়েক হাজার লোক এই র‍্যালিতে শামিল হয়। খাতায় কলমে এই র‍্যালির আয়োজক ছিল— অল জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স।

কিন্তু এই র‍্যালিটি বাদ দিয়ে পিওজেকেতে বের হওয়া অন্য র‍্যালি ও মিছিলগুলিতে লোকজনের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। বেশিরভাগ জায়গায় মাত্র ২৫-৩০ জন লোক জড়ো হয়েছিল। ছোটো র‍্যালিগুলির মধ্যে মুজফফরাবাদে বের হওয়া একটি র‍্যালিতে ১০০-১৫০ জন লোক হয়েছিল। এর বিপ্রতীপে অবাধ প্রাকৃতিক সম্পদের লুঠ ও চরম দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পিওজেকে জুড়ে সংঘটিত সাধারণ মানুষের আন্দোলন ও র‍্যালি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সূত্র মারফত পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী, পিরপঞ্জাল পর্বতে অবস্থিত পুঞ্চ জেলার সব চেয়ে বড়ো শহর রাওলাকোটে গত ২৭ মে শয়ে শয়ে লোক রাস্তায় নেমে আসে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে প্রতিবাদী স্লোগান, নিজেদের আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবের মুক্তির দাবিতে তারা সোচ্চার হয়। পিওজেকের ওপর এই ব্যাপক গণবিক্ষোভের মেঘ ধূমায়িত হওয়া ভবিষ্যতে এক বৃহত্তর বিস্ফোরণের ইঙ্গিতবাহী।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

শোক সংবাদ



নদীয়া জেলার বড়চাঁদঘর, লালদিঘী শাখার স্বয়ংসেবক, পূর্বতন প্রচারক অভিজিৎ ঘোষের মাতৃদেবী সুবর্ণলতা ঘোষ গত ৩১ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

তৃতীয়বারেও ক্ষমতাসীন হলেন নরেন্দ্র মোদী

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ভারতে তখন হিন্দু বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল। প্রতিনিয়িত হিন্দু মা-বোনের সম্ভ্রম লাঞ্ছিত। প্রতিমুহূর্তে হিন্দুর মঠ-মন্দির-গুরুদ্বার ধ্বংসের প্রহর গুনত। ইসলামিক শাসনে চতুর্দিকে ত্রাহি ত্রাহি আর্তচিৎকার। হিন্দুকে রক্ষা করার কেউ নেই। এমনই এক সংকটকালে মধ্য-ভারতের ভূমি থেকে উত্থিত হয়েছিলেন হিন্দুর ত্রাণকর্তা, যিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব'-এর ভাষায় খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিয়েছিলেন 'এক ধর্মরাজ্য পাশে'। যিনি রবীন্দ্রনাথের চোখে ছিলেন 'ধর্মরাজ্যের কারিগর'— তিনি হিন্দুপদপাদশাহী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। তার ঠিক ৩৫০ বছর পর (৬ জুন ১৬৭৪, ৪ জুন ২০২৪) ভারতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আগত আর এক হিন্দু বীর দেশের তাবড় হিন্দু বিরোধিতার চক্রব্যূহকে ছিন্নভিন্ন করে জাতিভেদে দীর্ণ, রাজনৈতিক চক্রান্তে বিভক্ত, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জাতিকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করে, তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিস্পর্ধা দেখালেন যিনি— তিনি হলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী।

প্রাক স্বাধীনতার কাল হতে দেশ তুষ্টীকরণের নেশায় বুঁদ ছিল। 'নকল রামধুন' হিন্দুর 'ঈশ্বর' আর মুসলমানের আল্লাকে এক আসনে বসিয়ে হিন্দু জাতির দফারফা করা হয়েছিল। তুষ্টীকরণের লালনপালনে বেড়ে ওঠা বিষাক্ত দ্বিজাতিতত্ত্ব সর্বনাশ করেছিল ভারতবর্ষের। তার ফলেই ভারত মায়ের অঙ্গহানি হলো, জন্ম হলো পাকিস্তানের। মুসলমান প্রধান পাকিস্তান হয়ে গেল ইসলামি দেশ আর ভারত হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি— সেকুলার ইন্ডিয়া রূপে। তোষণনীতি স্বাধীনতার ৭৫ বছরের পরেও এ দেশের চরম সর্বনাশ করে চলেছে। আজও ৮০ শতাংশ হিন্দুর দেশে হিন্দুর হয়ে কথা বলা মহাপাপ, শ্রীরামের দেশে রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, রামনবমী পালন চরম সাম্প্রদায়িকতা, ভগবান শিব ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের উপর দম্ভের সঙ্গে মাথা উঁচু করে রয়েছে চরম অপমানকর বিধর্মী স্থাপত্য, ঋষি কশ্যপের জন্মভূমি কাশ্মীর আজ হিন্দুর বধ্যভূমি। এমনকী শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দের বঙ্গ, পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা শ্যামাপ্রসাদের সাধের পশ্চিমবঙ্গ আজ জেহাদি সন্ত্রাসে জতুগৃহে পরিণত। প্রকৃতপক্ষে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার জাঁতাকলে পড়ে হিন্দু আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পদে পদে অসহায়, নিপীড়িত, অপমানিত।

ক'বছর আগে দেশের জ্ঞানী অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, এই দেশের সম্পদের উপর প্রথম অধিকার মুসলমানদের। ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই দেশের ৮০ শতাংশ হিন্দুর সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। অর্থাৎ হিন্দুর দেশে হিন্দুর সম্পদের উপর হিন্দুর নয়, অধিকার মুসলমানের। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সব সম্পদ মুসলমানের, আর অবশিষ্ট ভারতের সম্পদও মুসলমানের। অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের সবকিছুই মুসলমানের, হিন্দুর কিছুই নেই। তারা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে!

আগামী পাঁচবছর দেশের রাশ থাকবে মোদীর হাতে। আসন সংখ্যা আগের থেকে কিছুটা কম হলেও এই নির্বাচনেও তিনি জনাদেশ পেয়েছেন। তাঁর দল লাভ করেছে একক বৃহত্তম দলের মর্যাদা।

হিন্দুর দেশে হিন্দুকে নিঃশেষ করার এক সুচতুর চক্রান্ত এতদিন চলছিল। ঠিক যেমনভাবে ৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত আরবের মরুভূমির লুটেরার দল ভারতকে দার-উল-হারব থেকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার কাজ করে চলেছিল, ঠিক সেভাবেই ভণ্ড দুরাত্মা ও অতৃপ্ত রাজনীতির কারবারিরা শান্তির বাণী শুনিয়ে এতদিন এদেশ থেকে হিন্দুত্বকে চিরতরে ধ্বংস করার সুচতুর কৌশল করে আসছিল। কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টায় প্রথম বাধা এলো ২০১৪ সালে আজকের এই নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে।

তারপর একে একে কত লড়াই, কত সংগ্রাম। ভারতের হিন্দুদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার— সিএএ বিল পাশ, মুসলমান সমাজের নারীদের পশুতর জীবনের অসম্মানকর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত— তিন তালাক বাতিল, কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শিকড়ের উৎপাটনে ৩৭০ ধারা বাতিল, হিন্দুর পাঁচশো বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্তি রামজন্মভূমি মন্দির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এর জন্য মোদীকে কম অপমান সইতে হয়নি। কংগ্রেস তাঁর উদ্দেশ্যে 'মওত কী সওদাগর, নীচ, নর্দমার কীট, শয়তান, নাটকবাজ, শিল্পপতিদের দালাল, চোর'— হিন্দি অভিধানে যত রকম অমর্যাদাকর শব্দ, সবই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 'এগিয়ে বাংলা'র মতো দশ কদম এগিয়ে 'কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরাবো', 'তোর বাপের টাকা যে দিবি না', 'তুই-তোকারি' থেকে শুরু করে এই চব্বিশের নির্বাচনের প্রচারে এসে 'শ' দিয়ে, 'ব' দিয়ে দু-অক্ষর, চার-অক্ষর, ছ-অক্ষরের যত রকমের অশ্লীল ভাষা হয় সব শুনিয়ে দিয়েছেন।

শিকাগোর ভাষণে এক নরেন্দ্র যেমন বলেছিলেন, 'আমাদের ধর্মের শব্দকোষে 'Exclusion' বা পরিত্যাজ্য বলে কোনো শব্দ নেই— সকলেই আপন, এই নরেন্দ্রও 'ন হিন্দুঃ পতিতো ভবেৎ' অর্থাৎ কোনো হিন্দু আমার পর নয়— নীতি মেনে সব অসম্মান অপমান নিজ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠের মতো

নিশ্চুপ থেকেছেন। এরা আজকের নরেন্দ্রকে হারাতে রাজ্যে রাজ্যে হিন্দু বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করে তৈরি করেছে অশুভ জোট। কিন্তু কথাই বলে 'যে সয়, সে রয়'। ঈশ্বর মানুষের সহনশীলতার পরীক্ষা নেন। এত কুৎসার পরেও এই নির্বাচনে দেশের ১৪০ কোটি নরনারায়ণের আশীর্বাদে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়েছেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। গীতায় বলেছে, 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতিমম।।' অর্থাৎ যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন, সেখানেই বিজয়। যেখানে ১৪০ কোটি নারনারায়ণ আর ধনুর্ধারী নরেন্দ্র, সেখানে বিজয় তো হবেই। ভগবানের সেই মহাবাণী কি মিথ্যা হতে পারে?

বিজেপির এই জয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও দেশ বিরোধী ইন্ডি জোটের কাছে একটা বড়ো বার্তা। সে বার্তা হলো এদেশে কমিউনিস্ট বিচারধারার কোনো ঠাঁই নেই। যে কংগ্রেস একদা বালগঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দের ঐতিহ্য বহন করত, সেই কংগ্রেসের রাশ আজ 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে'-র কানহাইয়া কুমারদের দখলে। আরবান নকশালরা আজ কংগ্রেসের অ্যাজেন্ডা সেট করে দিচ্ছে। এবারের ঘোষণাপত্রে কংগ্রেস বলেছিল তারা ক্ষমতায় এলে ভারতে প্রপার্টি সার্ভে করে, কার কত সম্পদ আছে, কার কত সোনাদানা জায়গাজমি টাকাকড়ি ব্যাংক-ব্যালেন্স, সব হিসাব করে সেগুলি কেড়ে অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। অর্থাৎ এদেশের মঙ্গল চাওয়া, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মানা, একটি-দুটি সন্তানের পিতা-মাতার সঞ্চিত গচ্ছিত সম্পদ কেড়ে বিলিয়ে দেওয়া হবে চার বিবি আর ২৪ সন্তানের ভারে ন্যুব্জ, সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে দেশ দখলের স্বপ্ন দেখা জেহাদি মুসলমানদের মধ্যে। কী দারুণ পরিকল্পনা! নরেন্দ্র মোদী তাই যথার্থই বলেছেন 'এরা আমাদের ঘরের মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্র (সোনার তৈরি বিবাহের হার) কেড়ে নিতে চায়। সবটাই এদেশের হিন্দুর বিরুদ্ধে সুগভীর চক্রান্ত। শুধু তাই নয়, সারাদেশে জাতিগত জনগণনার নামে জাতির ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ক্ষমতা দখলের হীন চক্রান্ত এরাই করেছিল। এরাই উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বিরোধ বাধিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চায়। এই দেশের জনতা জনার্দন নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাসীন করে সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ইন্ডি জোটের অন্যতম মাতব্বর কমিউনিস্টরা বরাবরই দেশদ্রোহী ও হিন্দুধর্ম বিরোধী। ক'মাস আগে এদেরই এক সংগঠন 'তামিলনাড়ু প্রগ্রেসিভ রাইটার্স আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' এক সভার আয়োজন করেছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'ইরাডিকেশন অব সনাতন ধর্ম', অর্থাৎ সনাতন ধর্মের সমূল নাশ। সেই সভায় ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন বলেছিলেন, সনাতন ধর্ম হলো এইচআইভি, এইডস, ম্যালেরিয়ার মতো। তাই সকলকে সম্মিলিতভাবে সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আর ইন্ডি জোটের আরেক সহযোগী উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির নেতা স্বামী প্রসাদ মৌর্য বললেন, ভগবতগীতা ও রামচরিত মানস সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ায়। তাই এর বিনাশ চাই। ইন্ডি জোটের প্রায় সমস্ত দলই নিশ্চুপ থেকে সম্মতি জানিয়েছিল। কেউ কেউ তাদের সমর্থনে মুখও খুলেছিল। নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীজীর এই জয় সনাতন বিরোধী দলগুলিকে এই বার্তা দিল যে, এই দেশ সনাতনের। তোমাদের যাদের সনাতন ধর্মে অ্যালার্জি তারা ধীরে ধীরে পথ দেখো।

আগামী পাঁচবছর দেশের রাশ থাকবে মোদীর হাতে। আসন সংখ্যা আগের থেকে কিছুটা কম হলেও এই নির্বাচনেও তিনি জনাদেশ পেয়েছেন। তাঁর দল লাভ করেছে একক বৃহত্তম দলের মর্যাদা। তাঁর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের হাতে এই মুহূর্তে রয়েছে ৩০৩টি আসন। নরেন্দ্র মোদী হয়তো এবার দেশে শুরু করবেন বিদেশি চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে এনআরসি। দেশে অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা রোধে আনবেন জনসংখ্যা আইন। সারা দেশে সবার জন্য চালু করবেন এক আইন 'সমান নাগরিক সংহিতা'। হিন্দুর দেশে বসে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের গালি দেওয়া বন্ধে ব্যবস্থা নেবেন। আরও, আরও, অনেক কিছু। এবার আর কোনো ওজর আপত্তিতে কাজ হবে না। হয় 'রোগ সারবে, নয় রোগী মরবে। তাই আগে থেকে সাবধান হয়ে যান। এ দেশের বামপন্থীরা যাদের হিন্দুধর্মে অ্যালার্জি, যারা এতদিন হিন্দু ধর্মকে আফিম বলে অনেক গালিগালাজ করেছেন, যারা সমাজতান্ত্রিক ভারত গড়ার লক্ষ্যে অনেক লম্ফ ঝম্প করেছেন, তারা এবার পালটে যান।

অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের হাতে জন্ম, ব্রিটিশ কলোনিয়াল কালচারের প্রতিভূ কংগ্রেস, যারা এদেশ থেকে হিন্দু ধর্মকে চিরতরে সমাপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এদেশের সংবিধানে সেকুলার শব্দটি যোগ করেছিল (১৯৭৫ সাল, এমার্জেন্সির সময়), তারাও সাবধান হয়ে যান। যে সকল নকল গান্ধীর এদেশকে ভারতমাতা বলতে আপত্তি, তারা হয় পালটে যান, নয়তো নতুন করে 'ভারতমাতা কী জয়' বলা অভ্যাস করুন। নয়তো ইতালির পথ দেখতে হবে। এখন থেকে ভারত বিরোধী আবদার মামাবাড়িতে চলতে পারে, ভারতে বসে নয়। জাগ্রত জনগণ এই নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীকে নির্বাচিত করে আপনাদের সে বার্তাই দিয়েছে।

আর এদেশে বাস করা আরব সাম্রাজ্যবাদী জিহাদির দল, যাদের পূর্বপুরুষ এদেশে কেবল ধ্বংসলীলাই চালিয়েছে, হিন্দুর রক্তে হোলি খেলেছে, যাদের বর্তমান উত্তরসূরিরা কখনো মুসলিম লিগ, জামাতে ইসলাম, সিমি, পিএফআই, ইউডিএফ, এমআইএমআইএম, জামাত-ই-উলেমা হিন্দ ইত্যাদি নাম নিয়ে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে জিহাদের বার্তা দিতে চান, গজবা হিন্দের স্বপ্ন দেখেন, তারাও সাবধান হয়ে যান। বুঝে নিন এই দেশ গণতন্ত্রের দেশ। এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর অবমাননা ভারতেরই অবমাননা। এ আর বরদাস্ত নয়। যারা বন্দেমাতরম বলবেন না, ভারতমাতার জয়ধ্বনি দেবেন না, ভারতে বসে ভারত মায়ের স্তন্যপান করে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলবেন, তাদের আর এদেশ সহ্য করবে না।

সবশেষে বলি, এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী গ্যাং, যারা বিগত ১০ বছর ধরে 'এই অসহিষ্ণু ভারত আমার দেশ নয়' বলে কথায় কথায় 'অ্যাওয়ার্ড ওয়াপসির' ভয় দেখাতো, তারাও এবার সামঝে যান। এবার নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আপনাদের অ্যাওয়ার্ড ওয়াপসির হুমকিতে আর কাজ হবে না। কথায় কথায় ছিঁচকাঁদুনি গাওয়া নাসিরুদ্দিন, শাহরুখ, আমির, মহেশভাটদের মতো হাতি-ঘোড়ারা যেখানে তল পায়নি, তখন আপনারা মশা হয়ে আর কষ্ট করে জল মাপতে আসবেন না। হয় সমঝে যান, নয়তো কেটে পড়ুন। ভবিষ্যৎ বড়ো কঠিন। কারণ পুনরায় তৃতীয়বারের জন্য আসীন হয়েছেন হিন্দুকুলগৌরব শিবাজী মহারাজের উত্তরসূরি নতুন যুগের নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। □



নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ জোট তৃতীয়বার দেশের শাসন ক্ষমতায়

নরেন্দ্র মোদীর সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে জোট সরকার টিকিয়ে রেখে উন্নয়ন বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা।

আনন্দ মোহন দাস

ইতিমধ্যে নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে সকলেই অবগত হয়েছেন এবং নরেন্দ্র মোদীও প্রধানমন্ত্রী হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পর এই প্রথম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী কেন্দ্রে একটানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসীন হলেন। ১০ বছর শাসন ক্ষমতায় থাকার পর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সেদিক থেকে ভোটের ফলাফলে ভারতীয় জনতা পার্টির গর্বিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিরোধীদের জয়োল্লাসের যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এবারের নির্বাচনী রায়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের বিষয় সামনে উঠে এসেছে।

১. ভারতীয় জনতা পার্টি এককভাবে ২৪০টি আসনে জয়লাভ করে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও সমস্ত বিরোধী দলের ইন্ডি জোট একসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়েও ২৩০টি আসনে নিজেরা সীমাবদ্ধ রয়েছে। কংগ্রেস শত চেষ্টা করেও ১০০ আসনে পৌঁছতে পারেনি। কংগ্রেস মাত্র ৯৯টি আসনে জয়লাভ করলেও বিজেপি এককভাবে কংগ্রেসের চেয়ে ২৪৭ শতাংশ বেশি আসনে জয়লাভ করেছে। ইন্ডি জোটের কিছু ঘটকদল বিদেশি টাকার থলি নিয়ে ইতিমধ্যে ক্ষমতার লোভে এনডিএ জোট ভাঙার খেলায় মাঠে নেমে পড়েছে। কিন্তু তাঁরা ভুল করছেন, রাজনীতিতে বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে। সুতরাং তারা নিজেদের জোট বাঁচানোর দিকে মনোনিবেশ করলে বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। কারণ নরেন্দ্র মোদী কোনো কাঁচা খেলোয়াড় নন। তাই ভোটের ফলাফলে বিরোধী ইন্ডি জোটের অত্যধিক উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই।

২. এই প্রথম বিজেপি ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেডি ও কংগ্রেসকে হারিয়ে এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে ২১টির মধ্যে ২০টি আসনে জয়লাভ করে রেকর্ড করেছে।

৩. অরুণাচলপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হয়েছে।

৪. মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ জোট অন্ধ্রপ্রদেশ ও সিকিমে কংগ্রেসকে গুরুত্বহীন করে বেশিরভাগ আসনে জয়লাভ করে ক্ষমতা অর্জন করেছে।

৫. হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও সবকটি লোকসভা আসন বিজেপি জয়লাভ করেছে।

৬. এই প্রথম বিজেপি দক্ষিণে কেরালা রাজ্যে একটি আসনে জয়লাভ করে নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে এবং ১৬.৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করেছে। তাছাড়া তিরুবনন্তপুরমে বিজেপি মাত্র ১৬০০০ ভোটে পরাজিত হয়ে কংগ্রেসের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলেছে। লোকসভার ২০টি আসনেই বিজেপি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সিপিএম শাসন ক্ষমতায় থাকলেও একটি আসনে জয়লাভ করে কেরালায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

৭. দক্ষিণের তেলেঙ্গানা রাজ্যে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় থাকলেও কংগ্রেসের সঙ্গে সমসংখ্যক (৮) লোকসভা আসন জয়লাভ করে আগামীদিনে রাজ্যে কংগ্রেসের বিপদ ঘণ্টা বাজিয়েছে। এখানে বিজেপি লোকসভায় ২০১৯ সালের ১৯.০৭ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে ৩৫.১০ শতাংশ হয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে চাবিকাঠি হলো দলের মজবুত সংগঠন এবং বি আর এস সম্পর্কে জনগণের মোহভঙ্গ।

৮. তামিলনাড়ুতে বিজেপি আসন না পেলেও ১১.২০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে এই প্রথম নিজেদের শক্তি প্রমাণ করেছে। গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে বিজেপি মাত্র ৩.৬০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো শাসক ডিএমকে ২২টি আসনে জয়লাভ করলেও তাদের ভোটের হার হ্রাস পেয়ে ২৬.৯০ শতাংশ হয়েছে যা এআইএডিএমকে ও বিজেপি আঁতাত বজায় থাকলে জোটের ভোট ৩১.৭০ (২০.৫+ ১১.২০) শতাংশ পৌঁছাত। অনেক আসনের ফলাফলে প্রভাব পড়তো। ভোট কাটাকাটির জেরে ডিএমকে জোট বাজিমাত করেছে।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর্যালোচনা আরও কয়েকটি বিষয় সামনে উঠে এসেছে যা বিজেপির পক্ষে নির্বাচনী রাজনীতিতে শিক্ষণীয়।

১. উত্তরপ্রদেশে ২০১৯-এর তুলনায় বিজেপি ২৯টি আসন কম পাওয়ার জন্য বিজেপি কেন্দ্রে এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। এখানে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের আঁতাতে মুসলমান, যাদব ও দলিত ভোট এককাট্টা হয়ে বিজেপির যাত্রাভঙ্গ করেছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিএসপির প্রাপ্ত ২০ শতাংশ ভোট হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালে ৯ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ বিএসপির ১১ শতাংশ দলিত ভোট সমাজবাদী পার্টি জোট পাওয়ায় এককভাবে সমাজবাদী পার্টি ৩৭টি আসনে জয়ী হয়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে এবং উত্তরপ্রদেশে একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া ২০১৯ সালের ভোটে বিরোধী দলগুলো পৃথকভাবে লড়াই করেছিল। বলা বাহুল্য বিজেপির ৪০০ আসনের স্লোগানকে বিরোধীরা সংবিধান সংশোধনের নামে ভুল ন্যারেটিভ ছড়িয়ে এসসি, এসটি, দলিত ও পিছিয়ে পড়াদের সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার কথা বলে মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে। বিরোধীদের দ্বারা আরোপিত সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি বিজেপি সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি। যার ফলে দলিত, তফশিলি জাতি ও উপজাতি, পিছিয়ে পড়া সমাজ সংরক্ষণ হারাবার ভয়ে এককাট্টা হয়ে সমাজবাদী পার্টির জোটকে ভোট দিয়েছে। বিজেপি সংগঠনের অভাবে জাত পাতের সমীকরণকে হিন্দুদের আবহাওয়ায় কাজে লাগাতে অসমর্থ হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা, আত্মসন্তুষ্টি এবং বিরোধীদের জাতপাতের রাজনীতির ফলে দল ১৯টি আসন খুইয়েছে। কেবলমাত্র উন্নয়নমূলক কাজ দিয়ে নির্বাচনী রাজনীতি জেতা যায় না। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ওড়িশা, যেখানে নবীন পট্টনায়ক ২৫ বছর ধরে অনেক ভালো কাজ করার পরেও শাসন ক্ষমতা হারিয়েছেন। সুতরাং বিজেপিকে আগামীদিনে সচেতন থেকে সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করে জাতপাতের রাজনীতিকে পরাস্ত করতে হিন্দুত্বের জাগরণ ঘটাতে হবে। বুলডোজার দিয়ে অন্যায় কাজ বন্ধ করা যায় কিন্তু নির্বাচন জেতা যায় না। তথ্য সূত্রে আরও জানা যায়, বিজেপি ৪৮টি আসনে পুরানো প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই পরাজিত হয়েছেন অর্থাৎ এই সমস্ত এমপিদের কর্মকাণ্ডে জনগণের মোহভঙ্গ ছিল। তাঁরা জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সুতরাং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রার্থী নির্বাচনে আরও বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগীর ৩১টি নামের সুপারিশের মধ্যে ২৪টি নাম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাতিল করেছিলেন। তার কুফল ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে। এবিষয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সুপারিশকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মীদের যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দেওয়া দরকার। প্রার্থী চয়নে রাজ্যের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করলে দলকে ভুগতে হবে। তাছাড়া দল রামমন্দির নির্মাণের বিষয়টিকে সামনে রেখে হিন্দুভোট সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারেনি।

২. বিজেপি দলগতভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার আর একটি কারণ হলো মহারাষ্ট্রে বিজেপির ফল ভালো না হওয়া। এখানে শিবসেনা ভেঙে সরকার গঠন এবং এনসিপি ভেঙে দুর্নীতিগ্রস্ত অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে সরকার চালানোকে জনগণ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তার প্রতিফলন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে লক্ষ্য করা গেছে। বহুদিনের সঙ্গী শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরেকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব না দিয়ে একনাথ সিন্ধেকে মুখ্যমন্ত্রী করায় জনগণ বিজেপিকে যোগ্য জবাব দিয়েছে।

মহারাষ্ট্রে ২০১৯-এর তুলনায় বিজেপি ১৪টি আসন হারিয়ে মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করে দলকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। তুলনায় ছোটো আঞ্চলিক দল শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) ৯টি আসন পেয়ে বিজেপির সমতুল হয়ে উঠছে। বিজেপির ভুল স্ট্র্যাটেজিতে মহারাষ্ট্রে দলকে অপ্রাসঙ্গিক করে ছোটো দলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। আগামীদিনে বিজেপিকে এবিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং এই ধরনের রাজনীতি পরিহার করতে হবে। নতুবা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি শাসন ক্ষমতা হারাবে।

৩. বিগত দশ বছরে নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক কাজ, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ হ্রাস,

বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা, রেলের উন্নয়ন এবং অর্থনীতির সাফল্যকে জনগণের সামনে বিজেপি সঠিকভাবে তুলে ধরতে অপারগ ছিল।

৪. পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফলে বিজেপির আসন সংখ্যা ৬টি হ্রাস পেয়ে ১২টি হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিজেপি কর্মীদের মুষড়ে পড়া বা তৃণমূলের উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ বিজেপির এখানে মাত্র এক তৃতীয়াংশ আসনই কমেছে। কিন্তু যাঁরা ভরাডুবির কথা বলছেন, তাঁরা ভুল করছেন। বিজেপি গতবারের আটটি আসন ধরে রাখতে পারলেই ২০টি আসনে জয়লাভ করতে পারত। আসন সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একমাত্র কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজেপির ফলাফল খারাপ বলা যাবে না।

সংগঠন ও স্ট্র্যাটেজি ঠিক থাকলে ১২টি আসনে যেমন জয়লাভ করা গেছে, গতবারের ছ'টি আসনও ধরে রাখা যেত। সেজন্য মূল কারণ হলো সাংগঠনিক দুর্বলতা।

এখানকার নির্বাচনী বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিজেপি মাত্র ১২টি আসনে জেতার পরেও ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় প্রায় এক শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছে। সে তুলনায় তৃণমূলের প্রায় দুই শতাংশ ভোট কমেছে। ২০১৯ সাল থেকে লক্ষ্য করা গেছে, বিজেপির ঝুলিতে পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ শতাংশ ভোট কিন্তু কমেনি বরং বেড়েছে। সুতরাং সমর্থকদের নিরাশ হওয়ার মতো কিছু নেই। রাজ্যে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিধাসভা আসন সংখ্যা কমেছে কিন্তু বিজেপির বিধানসভায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের আসন সংখ্যা ছিল ২১৩ এবং বিজেপির ছিল ৭৭ কিন্তু বর্তমান লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বিজেপি বিধানসভায় ১৯২টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। সুতরাং তুলনামূলকভাবে বিধানসভায় বিজেপি তৃণমূলের চেয়ে বেশি সংখ্যক আসনে এগিয়ে রয়েছে।

লোকসভা ভোটের নিরিখে

কলকাতা কর্পোরেশনের ৪৮টি ওয়ার্ডে এবং দুর্গাপুর পৌরসভার ৪৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৩টি-তে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। সুতরাং ২০২৬ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির উৎফুল্ল হওয়ার বিষয় রয়েছে। সেজন্য বিজেপি কর্মীদের আশাহত হবার কিছু নেই। দল বুথ স্তরে সংগঠন গড়তে পারলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা অসম্ভব কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচনে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সিপিএমের ২৩টি আসনের মধ্যে ২১টি আসনেই জামানত বাজায়াপ্ত হয়েছে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে তারা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সিপিএম মাত্র ৫.৬৭ শতাংশ ভোট পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।



৫. পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনের ফলাফলে দেখা গেছে ১৪৬টি বিধানসভা আসনে বিজেপি ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। সুতরাং ৪-৫ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি করতে পারলেই বিজেপি তৃণমূলকে টেক্কা দেবে। সেজন্য ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করে বিজেপিকে এখন থেকে বুথ স্তরে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কারণ জনসভায় ভিড় বাড়ানো সহজ কিন্তু ভিড়কে ব্যালটে নিয়ে যেতে সংগঠন চাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে বিজেপির অনেক মণ্ডল সভাপতি আছেন যাঁরা নিজেদের মণ্ডলের সঠিক বুথ সংখ্যাই জানেন না। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই অভিজ্ঞতা অনেকের হয়েছে। সেজন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে সঠিক লোককে দায়িত্ব দিতে হবে, যারা নিঃস্বার্থভাবে দলের জন্য কাজ করবে তাছাড়া নবীনের সঙ্গে প্রবীণদের দলে গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই দল ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

৬. ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা ভারতে ৮৬টি আসন রয়েছে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা প্রতিনিধি নির্বাচনে শেষ কথা এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনের মধ্যে ১২টি আসনে তারাই ঠিক করে দেয় কে জিতবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সংগঠন মজবুত করে হিন্দুভোট বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। কারণ বিজেপি কোনোকালেই মুসলমান ভোট খুব একটা পায় না। কারণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাদের মৌলবি মোল্লাদের নির্দেশ অনুযায়ী তারা ভোট দেয়। এমনকী উন্নয়ন করলেও মুসলমানরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশের রামপুর লোকসভা কেন্দ্রের একটি গ্রামে জনসংখ্যা রয়েছে ২৩২২ জন, যারা সকলেই মুসলমান। এখানে কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৫৩২টি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু বর্তমান লোকসভা নির্বাচনে এই গ্রাম থেকে বিজেপি একটিও ভোট পায়নি। প্রকৃতপক্ষে দূরগামী লক্ষ্য নিয়ে মুসলমানরা

বিজেপিকে ভোট দেয় না। আর হিন্দুরা ভোট না দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।

৭. পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি লোকসভা আসনে পুরুষদের চেয়ে মহিলা ভোটার বেশি। এই রাজ্যে বিজেপির আসন কমে যাওয়ার পিছনে বড়ো কারণ রয়েছে মহিলা ভোট কম পাওয়া। নির্বাচনের প্রাক্কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মী ভাণ্ডার ৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০০/১২০০ টাকা করে মহিলা ভোট নিশ্চিত করেছেন। বাঙ্গালি মহিলারা ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের চেয়ে ভাতাকে গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন। সেই কারণে অধিকাংশ মহিলা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন।

ভোটের আগে কৌশলে তৃণমূল কর্মীরা মহিলাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি জিতলে লক্ষ্মী ভাণ্ডার বন্ধ হবে। এই ধরনের ন্যারেটিভ তৃণমূল কর্মীরা প্রকাশ্য সভায় এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের বুঝিয়েছে। সেজন্য তারা সকলেই ভয়ে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতার ফলে এর বিরুদ্ধে তারা কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরি করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে যে ১০০০ টাকার পরিবর্তে ৩০০০ টাকা ভাতা দেবে এবং প্রকল্প বন্ধ করার বিষয়টি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। যার ফলে মহিলারা ভুল বুঝে বিজেপিকে ভোট দেয়নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সংগঠন ও স্ট্র্যাটেজি ঠিক থাকলে ১২টি আসনে যেমন জয়লাভ করা গেছে, গতবারের ছ'টি আসনও ধরে রাখা যেত। সেজন্য মূল কারণ হলো সাংগঠনিক দুর্বলতা।

৮. কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে টাকা অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে তা তৃণমূল জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বিজেপি এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের সামনে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে পারেনি। যার ফলে এই প্রকল্পগুলির উপভোক্তারা এককাট্টা হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। এছাড়া দুর্নীতির জন ব্যক্তি আক্রমণে না গিয়ে প্রকৃত তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক। চোর বলার চেয়ে চুরির তথ্য সামনে নিয়ে আসা উচিত।

৯. তৃণমূল মিথ্যাচার করে এনআরসি, সিএএ-এর জুজু দেখিয়ে মুসলমানদের আরও বেশি সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেআইনিভাবে ওবিসি সংরক্ষণ দিয়ে মুসলমানদের ৯৮ শতাংশ চাকরি দিয়েছিলেন তা নির্বাচন চলাকালীন কলকাতা হাইকোর্ট বাতিল করে রায় দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী জনসভায় প্রকাশ্যে এই রায় মানি না বলে তৃণমূলের সপক্ষে মুসলমানদের আরও বেশি এককাট্টা করেছেন এবং মুসলমানরা ভয়ে তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছে। সেই হিসেবে প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে গেছে। সুতরাং অঙ্কের হিসেবে মুসলমান ভোট ছাড়া তৃণমূল ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ হিন্দু ভোট পেয়ে বাজিমাত করেছে। সেদিক থেকে প্রায় ৩৯ শতাংশ (৩৮.৭৩) হিন্দু ভোট বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে ৬-৭ শতাংশ হিন্দু ভোটের দিকে নজর দিতে হবে, তবেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে। সেজন্য সংগঠনকে এখন থেকে হিন্দুত্বের সপক্ষে কাজ করতে হবে।

১০. ঠিক নির্বাচনের আগে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রার্থীর আসন পরিবর্তনে বিজেপি বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়নি। কারণ একেবারে নির্বাচনের ঠিক আগে নতুন প্রার্থী অপরিচিত জায়গায় নিজের সংগঠন ও কৌশল ঠিক করতে সময় পায় না। অর্থাৎ তাঁর কেন্দ্রের চিত্র নিজের কাছে পরিষ্কার থাকে না। একথা সত্য অপরিচিত মাঠে খেলার চেয়ে চেনা মাঠে খেলায় প্রার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ বেশি করেন। সংগঠন শক্তিশালী না থাকলে এই ধরনের পরীক্ষা দলের বিপক্ষে যায়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে বিজেপির সিদ্ধান্ত কয়েকটি আসনে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে বিজেপি সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক নোটায় ভোট পড়েছে ২৬০০০ বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রার্থী চয়নে বিজেপির সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেছে। তিনি মাত্র ৩২০০০ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে নোটায় ভোট পড়েছে প্রায় ১৮০০০ কিন্তু দলের প্রার্থী মাত্র ৬০০০ ভোটে হেরেছেন। সুতরাং সঠিক প্রার্থী নির্বাচন দলের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে বলে মনে করি। আগামী ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বিজেপিকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপিকে সংগঠনের সঙ্গে ব্যক্তিকে সামনে রেখে লড়াই করলেও ব্যক্তি পূজা বন্ধ করতে হবে। কারণ বিজেপি আদর্শবাদী দল, এই ধরনের ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্লোগান মানুষ পছন্দ করে না। এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ৪০০ পার এবং মোদী গ্যারান্টির স্লোগান বিজেপির কাছে বুমেরাং হয়ে গেছে। বরং স্লোগানের ফলে বিপক্ষ সংবিধান সংশোধনের নামে দলিত, জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া সমাজকে সংরক্ষণ বিষয়ে ভুল বুঝিয়েছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় ২০০৪ সালে একইভাবে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়ে 'ইন্ডিয়া সাইনিং'-এর স্লোগানও বিজেপির পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষে জোট সরকারের অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো নয়। কারণ এর ফলে আর্থিক সংস্কার মার খায় এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বাধ্যবাধকতা থাকে। শরিকদের দাবি পূরণ করতে এবং সরকার বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীকে নিত্যদিন মাথা ঘামাতে হয়। সর্বসম্মতিক্রমে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে থাকে এবং শরিকদের উপর নির্ভরশীল সরকারের পথ খুব একটা মসৃণ হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, দেশের পক্ষে জোট সরকার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। এবারেই নরেন্দ্র মোদীর সামনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে জোট সরকার টিকিয়ে রেখে উন্নয়ন বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। মোদীর ক্যারিশমা দেখার জন্য আমাদের আগামীদিনের অপেক্ষা করতে হবে। □

আবার একবার মোদী সরকার

প্রদীপ মারিক

দেশবাসী তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করলেন নরেন্দ্র মোদীকে। দেশবাসী মনে করে নরেন্দ্র মোদী গণতন্ত্রের যোগ্য পুরোহিত। দেশের মানুষ তাই তৃতীয়বার এনডিএ-তেই আস্থা রেখেছে। এটা ভারতের ইতিহাসে ভারতীয় জনতা পার্টির এক ঐতিহাসিক কীর্তি। কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে এই ধরনের ধারাবাহিক সাফল্য নেহরু ছাড়া আর কারও নেই। সেই সাফল্যকে ধরে রাখলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বললেন, আমাদের এই জোট ভারতের আত্মা, শেকড়ের প্রতিবিম্ব। আমরা সর্বতোভাবে সংবিধানের প্রতি সমর্পিত। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভোটপূর্ব জোট এতটা সফল হয়নি আগে। সরকার চালানোর জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন, গণতন্ত্রের সেটাই নিয়ম। কিন্তু দেশ চালানোর জন্য দেশের মানুষের সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের কাছে সেটাই রয়েছে, তাই দেশের উন্নতিতে আমরা কোনো ফাঁক রাখতে পারব না। এনডিএ সবচাইতে সফল জোট।' তিনি আরও বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আগামী দশ বছরে এই জোট সুশাসন, বিকাশ, নারী ক্ষমতায়ন, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবনে সরকারের দখল কমিয়ে আনবে। আমার কাছে সমস্ত দলের প্রতিনিধিই সমান। সবাইকে বুকে টেনে নিতে কখনোও কার্পণ্য করিনি। যে দলগত ভাবনা থেকে, তৃণমূল স্তর থেকে আমরা কাজ করেছি, সবটাই আমাদের জোটকে মজবুত করেছে। কেবলমাত্র হাত নেড়ে, ছবি তুলে জোটবদ্ধতা প্রমাণ করতে চাইনি। স্থানীয় ও যাবতীয় স্তরের চাহিদা ও আকঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয়।' এটাই তো প্রকৃত দেশনেতার কথা। কারণ তিনি সকল জনপ্রতিনিধিকে সমান চোখে দেখেন। তাঁর এই কথায় প্রত্যেক দেশবাসীর গর্ব হওয়া উচিত। ভারতীয় গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধারণায় প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির ওপর নির্ভর করে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠু আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি শাসন-ব্যবস্থা যেখানে সরকারি ক্ষমতা দেশের মানুষের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। নরেন্দ্র মোদীর একটার পর একটা উন্নয়নের কাজ দেশের জনগণ সাদরে গ্রহণ করেছে, এটা বারবার প্রমাণিত। বিরোধীদের কাজই তো বিরোধিতা করা, গণতন্ত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তারা বিরোধিতা করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেটা হওয়া উচিত তা গঠনমূলক বিরোধিতা। ইন্ডি জোট বিভিন্নভাবে সংসদ অচল করে দিতে চাইবে, তাই সজাগ থাকতে হবে বিজেপি-সহ সমস্ত শরিকদের। একটি ছোট্ট ভুলও যেন না হয়। সংসদে এবার তাই কঠিন লড়াই। সরকারকে বিচক্ষণতার প্রমাণ রাখতে হবে। ২০২৪-এও বিরোধীপক্ষ বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করবে, কিন্তু দেশের স্বার্থে তাদেরও বোঝাতে হবে। বিরোধীদের প্রধান দায়িত্ব হলো, প্রশাসনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা, বিদ্যমান আইনে পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া এবং যারা অন্য পক্ষকে সমর্থন করেছে তাদের স্বার্থে কথা বলা। সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বিরোধী দলগুলি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। বিরোধী দলগুলি সরকারের সিদ্ধান্ত, নীতি ও কাজগুলি যাচাই করে। তারা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং সরকারকে তার কাজের কৈফিয়ত দাবি করে। বিরোধী দলগুলি সামাজিক সমস্যার জন্য অন্যান্য আইন, নীতি ও পন্থা উপস্থাপন করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে তারা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পথ প্রশস্ত করে এবং দেশের উন্নতির জন্য দায়বদ্ধতা বজায় রাখে। সরকারি বিল ও উদ্যোগগুলির আলোচনা করে যাতে কোনো ত্রুটি, সংশোধন বা সম্ভাব্য প্রতিকূলতার দিকগুলি এড়ানো সম্ভব হয়। আইনের কার্যকারিতা ও ন্যায়সঙ্গতা উন্নত করতে তারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরামর্শ দেয়। সংসদীয় অধিবেশন চলাকালীন বিরোধীদলগুলি সরকারের মন্ত্রীদের উত্তর, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা পেতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে পারে। এই পদ্ধতি সরকারকে সঠিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে সহায়তা করে। তাতে দেশের গণতন্ত্র আরও মজবুত হয়।

বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদীয় কমিটিতে বসেন যেগুলি বিশেষ সরকারি কার্যক্রম বা নীতি ডোমেইন তত্ত্বাবধানের ভূমিকায় থাকে। তারা সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়ন করে, নীতিমালা মূল্যায়ন করে এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সংস্কারের জন্য পরামর্শ প্রদান করে। আউটরিচ প্রোগ্রাম, পাবলিক ইভেন্ট এবং প্রচারণার মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণকে অংশগ্রহণে উদ্দীপিত করে, তাদের ধারণার জন্য সমর্থন তৈরি করে এবং রাজনৈতিক উদ্বেগ সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

একটি শক্তিশালী বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকে জনগণের দাবি ও উদ্বেগের প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বাধ্য করে। তাতে সরকারও জনগণের স্বার্থে কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত হয়, আরও সচেতন হয়। সরকারের সবসময় মনে থাকে, তাদের সিদ্ধান্তগুলি খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং চ্যালেঞ্জও করা হতে পারে। সরকারকে তার কাজের জবাবদিহি করতে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিহার্য। তারা তথ্য অনুসন্ধান করে সংসদীয় প্রশ্ন, বিতর্ক এবং অডিট কমিটি-সহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা দাবি করে। লোকসভার বিরোধী দলনেতার ভূমিকা সংসদীয় রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিং এবং যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্য হন তিনি। সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন, সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন, সিবিআই ডিরেক্টর, জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের চেয়ারপার্সন এবং লোকপাল চয়ন কমিটিতেও শামিল থাকেন বিরোধী দলনেতা। সংসদ ভবনে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের উপস্থিতি মনে করিয়ে দেবে ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ টানা তৃতীয়বার দেশের শাসন ক্ষমতার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত। তাঁর নেতৃত্বেই দেশের গৌরব ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। আগামী পাঁচবছর এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে এবং বৈশ্বিক মঞ্চে এক প্রগতিশীল জাতি হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে। □

গণতন্ত্রের উৎসব তো হলো, এবার একটু মূল্যায়ন

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রবি ঠাকুরের এক লেখায় পড়েছিলাম, সব হার-জিৎ বাইরে থেকে দেখা যায় না। রাজনীতির হার-জিৎটাও বড়ো ধাঁধালো। শুধুমাত্র আসন, একটা, দুটো, পাঁচটা আসনে ভোটের হার বাড়ল কী কমল, তা ক্ষমতার মাপকাঠি হয় বটে, কিন্তু হার-জিতের শিকড় অনেকটা গভীরে। হার-জিৎ কোনো ঝটিকার বার্তা নয়, যা শুধুমাত্র পরিসংখ্যানেই থমকে থাকে। দেখতে হবে, পরিসংখ্যানের পর মানুষ ও কর্মী-সমর্থকের অভিব্যক্তি, অভিযোগ, অভিউল্লাস। শিরোনামে ছুটছে বিজেপি ২৪০ , পশ্চিমবঙ্গে আসন ১২টি। ২০১৯-এও পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ২০২৪-এও তাই। পার্থক্য এটাই, এবার রাসমেলার মতো প্রাকনির্বাচন ধুমধাম চোখে পড়েছে। কত সরঞ্জাম, কত হইচই। দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ বুলিয়েই রব উঠেছিল ২৫, ৩০ বা মানুষ চাইলে আরও বেশি আসন পাবে বঙ্গ বিজেপি। তারপর বুকের মধ্যে কাঁটা নড়তে নড়তে তা এসে দাঁড়াল ১২টিতে। ২০১৯-এ বিজেপির ১৮টি আসন লাভ অপ্রত্যাশিত ছিল আর এবার এক ডজন আসন লাভ দ্রষ্টার কাছে অতি প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রাণ হাঁফিয়ে আশা করাদের কাছে অপ্রত্যাশিত।

এবারে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হলো। যেমন, সভার ভিড় বিজেপির ক্ষেত্রে ভোটে রূপান্তরিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর বারবার আগমনে শহরে-মফস্সলে-গ্রামে যে উন্মাদনা চোখে পড়েছিল, তা ছিল নিছক স্নায়ু উত্তেজনা। ভোটাররা প্রধানমন্ত্রী আর বঙ্গ বিজেপিকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বলে মনে করেছে। মানুষ ভিড় করেছে শুধুমাত্র একজন আইকনকে দেখতে। কিন্তু ভোট দেবে কাকে? ভোট কি আবারও অন্য দল থেকে এসে গতকাল টিকিট পাওয়া কাউকে দেবে? ভোট কি তাকে দেওয়া যায় যে রাজ্য রাজনীতিতে বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই দেয়নি দলকে?

ঘাটতি কী কী তা মাপা ভোটের হিসেবের চাইতেও আরও পরিমাপসিদ্ধ। নির্বাচনে আশানুরূপ ফল হলো না পশ্চিমবঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ট্রোল করাই যায়। ট্রোলযোগ্যই বটে তিনি। কিন্তু তাকে ট্রোল করল যারা তারাই যদি ভোট ময়দানে পিছিয়ে যায়! অতঃপর অঙ্ক দাঁড়াল, ট্রোলিং কোনো প্রচার নয়। এরাজ্যের ক্ষেত্রে বিজেপিকে মনে রাখতে হতো, এখানে ইনডেক্স অব অপোজিশন ইউনিটি কেরালার মতো উচ্চ নয়। এই রাজ্যে এই মুহূর্তে দুটি দলের লড়াই চলছে — বিজেপি ও তৃণমূল। তাই তৃণমূলের ঘরে তা ইনডেক্স অব অপোজিশন ইউনিটির জন্য ফাঁকা মাঠে গোল। তৃণমূলের যত অনিয়ম, রাজনৈতিক অভদ্রতা, প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়ন, তার বিরুদ্ধে যদি সক্রিয় আন্দোলনে সোচ্চার হতো,এরাজ্যের বঞ্চনাগুলি সেক্ষেত্রে যথার্থ বিচার পেত। চরম বিজেপি বিরোধী ব্যক্তিও স্বীকার করবেন কেন্দ্রীয় সরকার গত দশ বছরে দেশে সার্বিক বিকাশ কতটা করেছে। কিন্তু এরাজ্যের ক্ষেত্রে বারবার শোনা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকক্ষ কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরনের রাজনীতি করছেন তার নিন্দা ও বিরোধিতা করাটা সুশীল সমাজের দায়িত্ব। কিন্তু তিনি যেভাবে রাজনৈতিক সম্মোহিনীর জাল পশ্চিমবঙ্গে বিস্তার কছেন তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার। তাই আগামীতে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ওয়ার্ম আপ দরকার। দরকার সেই মাটির কাছাকাছি মানুষদের অভিযোগ বোঝা। দশ বছর ধরে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে রয়েছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই সরকারের প্রতি অভিযোগ, টুকরো টুকরো দুঃখ, খুচরো না পাওয়ার অভিমান উঠবে। যাকে অ্যান্টিইনকামবেন্সি বলে। কিন্তু আমাদের অন্য যে ব্যাধি আছে, তা হলো নিজেদের প্রতিই অভিযোগ, অভিমান। যা বারবার প্রকাশ্যে এসেছে। কান পাতলেই কত অভিযোগ, কর্মী বঞ্চনার রাশি রাশি মুখ, ভারাক্রান্ত মন দেখা যায়। এত অনুকূল পরিস্থিতিতেও এবারে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রের বাইরে কর্মী ক্যাম্প চোখে পড়েনি। কিন্তু হলফ করে বলা যায়, প্রতিটা গলিতে, পাড়ায় বিজেপির সমর্থক, অনুরাগী, কর্মীস্রোত বহমান। তাকে জোয়ারে পরিণত করার জোরটা এবারে বড্ডো অভাব ছিল।

নিশ্চিত যে মোদী জনপ্রিয়তা থাকলেও মোদী ম্যাজিক এবারে সার্বিকভাবে কাজ করেনি। বিজেপি গত দশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। একাধিক গঠনমূলক এবং রাষ্ট্রবোধ-ভিত্তিক কাজ হয়েছে, যা বিশ্বের দরবারে সমাদৃত। কিন্তু দরকার ছিল রাজ্যভিত্তিক সেন্টিমেন্ট বিবেচনার। নরেন্দ্র মোদীর ক্যারিশ্মা থেকে নিজেকে এড়ানো যাবে না। কিন্তু ভোটার ভাবল, কাছের কে? এবারে মানুষ খুব অসহায় ছিল, বিভ্রান্ত ছিল। বিরুদ্ধ রাজনৈতিক কলহ শুনেই চলেছে। এলাকাভিত্তিক কে কাছের এবং কে কাজের সেই লড়াই হয়েছে এবার। সেই লড়াইয়ে বিজেপি পরাজিত। বিজেপি একটা গঠনমূলক কর্মসংস্কৃতির দল হয়েও চোর, তোলাবাজ, আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তৃণমূলের মোকাবিলা করতে পারল না।

রাজনৈতিক দল মানে তো কেবলমাত্র ভিড় নয়। ভিত্তি। অসংখ্য সমর্থক, কর্মী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জাতীয়তাবোধে ঋদ্ধ থাকেন। তাঁরা বিজেপি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। তাঁরা শুধু নিজেকে হিন্দু বলেই থেমে থাকেন না, আজীবন সেটাকে রক্ষা করেন। এই ফলের পর অনুভব করতে হবে কোনটা ধুয়ো আর কোনটা আবেগ। কারা শুধুই ব্যক্তি স্বার্থে রাজনীতি করেন আর কারা স্বার্থত্যাগী এবং স্বপ্নসন্ধানী। যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি দুর্নীতির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাতে প্রতিটি ইস্যুকে সঠিকভাবে তুলে ধরলে তৃণমূলের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হতো।

নির্বাচনে হার-জিতের চাইতেও অভ্যন্তরীণ জয়টা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতিহাস পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সেই কথাই বলে। পশ্চিমবঙ্গেও যেন সেই সুরই বাজে। চৈতন্যের রাজনীতি তার দিনের জন্য অপেক্ষারত। বঙ্গ বিজেপি নিশ্চিতভাইে পারবে, কারণ বিজেপি শুধুমাত্র পার্টি নয়, পার্টি উইথ ডিফারেন্স। ▯

ভারতের হিন্দুরা জাগবে কবে?

সামাজিক মাধ্যমে দিনকয়েক আগে চোখে পড়লো একটি লেখা। সেখানে বলা হয়েছে— ভবিষ্যতে ভারতে বিজেপি থাকবে না, তৃণমূল থাকবে না, কংগ্রেস থাকবে না, বামফ্রন্ট থাকবে না, কারণ সৌদি আরবের এক অধ্যাপক নাসির বিন সুলাইমান উল ওমর বলেছেন, 'ভারতের হিন্দু সমাজের ভাইয়েরা এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ভারতে ইসলাম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হাজার হাজার মুসলমান পুলিশ, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্রে অনুপ্রবেশ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় প্রবেশ করেছে। একটি জাতির উত্থান হতে যেমন যুগ যুগ সময় লাগে, তেমনি তার ধ্বংসের জন্যও সময় লাগে। তাই ভারত রাতারাতি শেষ হবে না। এটিকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে।'

মুসলমানরা এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করছে। ভারতে প্রতিদিন প্রায় ৬৫,০০০ শিশুর জন্ম হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ মুসলমান শিশু এবং প্রায় ২৫,০০০ হিন্দু এবং অন্যান্য। অর্থাৎ জন্মহার মুসলমানদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ। এখন জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং হিন্দুরা সংখ্যালঘু। এই হারে, ২০৫০ সালের মধ্যে মুসলমানরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তখন ভারতকে ইসলামি দেশ হতে কেউ বাধা দেবে না। তখন মুসলমানরা হিন্দুদের শাসন করবে। আজ, সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, মুসলমানরা দেশের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ, কিন্তু বাস্তবে তারা ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।

সরকারি পরিসংখ্যানও ভুল, কারণ ওয়াহাবি মুসলমানরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করে এবং হিন্দুদের অচেতন রাখার জন্য এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে তাদের অস্ত্র হিসেবে প্রচার করে না। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভারতে চলছে মহাপ্রতারণা, কিন্তু হতভাগ্য হিন্দুরা এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হিন্দুরা কেন কাশ্মীরের দিকে তাকিয়ে শিক্ষা নিল না, যেখানে হিন্দুদের তাদের সমস্ত ধনসম্পদ, বাড়ি ও মেয়েদের পিছনে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যতদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে ততদিন ভারত ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে। তারা সংখ্যালঘু হলে তাদের কী হবে কেউই জানে না। এই বোকা হিন্দুরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের পরিস্থিতি বোঝারও চেষ্টা করে না। হিন্দু কখনো কথা বলবে না, নীরব থাকবে, উচ্চ নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করবে।

তাই ভবিষ্যতে হিন্দুর ভাগ্য অবশ্যই ডুববে। হিন্দুরা নিশ্চিতভাবে নিঃশেষ হতে চলেছে। তবুও হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হলো না। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং অন্যান্য রাজ্যের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বিবেচনা করে দেখলে সহজেই বোধগম্য হবে। এছাড়া জাম্বিয়া ও মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলিকে ইসলামি দেশ ঘোষণা করা হয়। লন্ডন, সুইডেন, ফ্রান্স ও নরওয়ের মতো দেশে প্রতিদিন সহিংসতা ঘটে। একজন হিন্দু হিসেবে কি কখনো ভেবে দেখেছেন কেন এমন হচ্ছে? মানুষের মধ্যে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং তাদের হৃদয়ের কথা বলার সাহস না দিয়ে ভয় জাগানোর নামে শান্তিরক্ষা তাদের কৌশলের অংশ। হিন্দুরা কি বোঝে না, মুসলমানরা নামাজের নামে দিনে ৫ বার সমজিদে জড়ো হয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে!

তাই চোখ ও মুখ বন্ধ করে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমন সময় আমাদের চোখ খোলার, মুখ খোলার এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির সময়। ভাবুন এবং বুঝুন। জেগে উঠুন। তা না হলে ভবিষ্যতে পালানোর জায়গা পাবেন না। একদিন এক আগরওয়াল সাহেব তার ভৃত্য আব্দুলকে জিজ্ঞাসা করলেন— আমার ২টি সন্তান আছে এবং আমি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু তোমার ১২টি সন্তান আছে এবং তুমি এখনও চিন্তিত নও কেন? উত্তরে আব্দুল্লা বলে, ২৫ বছর পর আমার ১২টা ছেলে আপনার দোকান দখল করবে। আপনি শুধু আমাদের জন্যই রোজগার করছেন, তাহলে আমি কেন চিন্তা করবো। ভাবুন, এটা মুসলমানে মনের কথা।

শিয়ালকোট, লাহোর, গুজরানওয়ালা ও করাচিতে হিন্দুদের দ্বারা নির্মিত প্রাসাদগুলি মুসলমানদের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এমনকী স্বাধীন ভারতেও, কাশ্মীরি হিন্দুরা বিশাল অট্টালিকা তৈরি করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা সেগুলি দখল করেছে। আজ অযোধ্যায় ভগবান রামচন্দ্রের মূর্তি স্থাপন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট বিরোধীরা সুড়সুড়ি দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ওদের একজোট করতে সমর্থ হয়েছে। লোকসভা ভোটের ফলাফলে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশের মুসলমানরা ৯৫ শতাংশ ভোট বিজেপি-র বিরুদ্ধে দিয়েছে এবং তারা অনেকগুলো আসনে জয়লাভ করেছে। যদি হিন্দুরা এখনও না জাগে তবে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ভারতবর্ষকে ইসলামিক দেশ হতে কেউ আটকাতে পারবে না।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিমমেদিনীপুর।

লোকসভা ভোটের ফলাফলে রাষ্ট্রবাদী মানুষের মুষড়ে পড়ার কারণ নেই

লোকসভার নির্বাচনের যে ছবি সামনে এসেছে তাতে কতগুলো বিষয় পরিষ্কার হলো। সেগুলো হলো— (১) বুথ ফেরত সমীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এর আগে বিভিন্ন সময়ে যেসব এক্সিট পোল হয়েছে তাতে মিশ্র ফল পাওয়া গেছে। কোনো কোনো এক্সিট পোলের সমীক্ষা হুবহু মিলে গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মেলেওনি। এবারের ১৪টি

এক্সিট পোল সমীক্ষা করুণভাবে মিললো না। আগামী নির্বাচনে এই একজিট পোলের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু থকবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদী একটা আওয়াজ তুলেছিলেন, 'অব কী বার চারশো পার' স্লোগান। এই স্লোগানের স্রষ্টা নরেন্দ্র মোদীও জানতেন যে, ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা তাতে কোনো দলের পক্ষে নিরঙ্কুশভাবে চারশো পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মোদীর এই রকম একটা স্লোগানের উদ্দেশ্য মূলত দুটি। একটি হলো তৃণমূল স্তরে কর্মীদের উৎসাহিত করা এবং অপরটি হলো যে সমস্ত ভাসমান ভোটারদের কাছে বার্তা দেওয়া যে, নির্বাচনে যখন বিজেপিই জিতবে তখন কেন অন্য দলকে ভোট দেওয়া। কিন্তু ৪ তারিখের যে ফলাফল সামনে এলো তাতে বিপরীত চিত্র সামনে চলে এলো। বিজেপি বা তার জোট চারশো আসন পাওয়া তো দূরস্থান, বিজেপির চাকা থেমে গেল ২৪১ আসনে এবং জোটের চাকা থমকালো ২৯২-এ। এবারের নির্বাচনে কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হলো না বটে, জোট হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো এনডিএ জোট। স্বাভাবিকভাবেই সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বেশি আসন পাওয়া জোটের নেতাকে ডাকবেন সরকার গঠনের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির যে আশানুরূপ ফল হলো না তার যদি চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায় তবে বলা যায়— (১) একশো দিনের টাকা দেওয়া কেন বন্ধ করেছে কেন্দ্র, তা জনসমক্ষে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। বঙ্গ বিজেপি একশো দিনের কাজের টাকা বণ্টনে যে ভয়াবহ দুর্নীতি হয়েছে এবং কাটমানি নিয়েছে দলনেতারা। আবাস যোজনায় একই কথা প্রযোজ্য। দোতলা বাড়ি রয়েছে এমন অনেক নেতাই যে কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকা আত্মসাৎ করেছে তা প্রমাণিত। তবুও তৃণমূল এটা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছে। গ্রামের মানুষ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার মিথ্যা তৃণমূলের প্রচার খেয়েছে। বঙ্গ বিজেপির উচিত ছিল এই ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

(২) দিলীপ ঘোষের জেতার সম্ভাবনাকে হত্যা করা হলো। দিলীপ ঘোষকে তাঁর নিজের জেতার স্থান পরিবর্তন করায় দুটো আসন হারালো বিজেপি। এক মেদিনীপুরের দিলীপ ঘোষের নিজস্ব জেতা আসন এবং দুর্গাপুরের আসনটি।

(৩) ২০১৯-এর নির্বাচনে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে যে সাফল্য পেয়েছিল বিজেপি, তা এ পর্যন্ত সর্বকালের রেকর্ড।

(৪) এসব সত্ত্বেও বিজেপির নির্বাচনী ফলাফল মোটের ওপর খারাপ নয়, তো বটে, হতাশাজনক তো নয়ই। কারণ এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ভোট পেয়েছে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৩ ভোট যা কিনা গত বিধানসভা নির্বাচন থেকে ১২ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৪৮ কম। আর বিজেপির ভোট বেড়েছে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০৭টি।

এদিকে তৃতীয়বারের জন্য এনডিএ জোট নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে শপথ নিতে চলেছে আগামী ৯ জুন। ইন্ডি জোটের জারিজুরির অবসান ঘটলো শেষ পর্যন্ত। একটা বিষয় পরিষ্কার যে, বিগত একদশক মোদীজী যে সরকার চালিয়েছেন সেখানে কিছুটা রাশ এলো। এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কারণ এবারেও বিজেপির একক ভাবে বৃহত্তম দলের মর্যাদা অর্জন করেছে। সুতরাং নির্বাচনের এই ফলাফল মোটেই হতাশাজনক নয়। নতুন সরকারের আশু কর্তব্য হলো এই রাজ্যের যত দুর্নীতি তার দ্রুত তদন্ত শেষ করে অপরাধীদের যথাযথ শাস্তির বিধান করা এবং তা হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে অপশাসনকে অপসাহিত করা ত্বরান্বিত হবে বলে মনে হয়।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

হিন্দুরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক

এনডিএ জোট তৃতীয়বার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে, আর নাবালক সমর্থকদের ভাব এমন যে, বাপ-মা মারা গেছে। ইন্ডি জোট সবাই মিলেও বিজেপির সমান আসন পায়নি, তবু এদের বডি ল্যাংগুয়েজ এমন যে, ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করে আফগানিস্তান বানিয়েছে।

বিজেপি ভুল থেকে এবার শিক্ষা নেবে, নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করবে। পিকে-দের ছাড়াই সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করবে। কাজ ছেড়ে মনমরা হয়ে থাকবেন না। পুরানো ভুল শুধরে নিন। মরার আগে বার বার মরবেন না।

যেখানে সংখ্যালঘুদের ক্ষমতা ছিল, নিজেদের নির্দল ক্যান্ডিডেটকে জিতিয়েছে অধীর চৌধুরীকে হিন্দু হবার জন্য মুসলমানরা ভোট দেয়নি, কিন্তু একজন অবাঙ্গালিকে জিতিয়েছে, যে মুসলমান। সেলিমের ছাড়া বাকি বামপন্থীদের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পঞ্জাব, কাশ্মীর, ইউপি, হায়দরাবাদ সর্বত্র একই ছবি। বিজেপির বিরুদ্ধে মুসলমানদের ভোট দিতে প্ররোচিত করেছে বিরোধীরা? এরা কি বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে?

নির্বাচনে অশনি সংকেত খালিস্তানপন্থী শিখ ও মুসলমানদের থেকে। যেখানে এদের ক্ষমতা ছিল, নিজেদের নির্দল ক্যান্ডিডেটকে জিতিয়েছে বা নিজেদের সম্প্রদায়ের ক্যান্ডিডেটকে জিতিয়েছে।

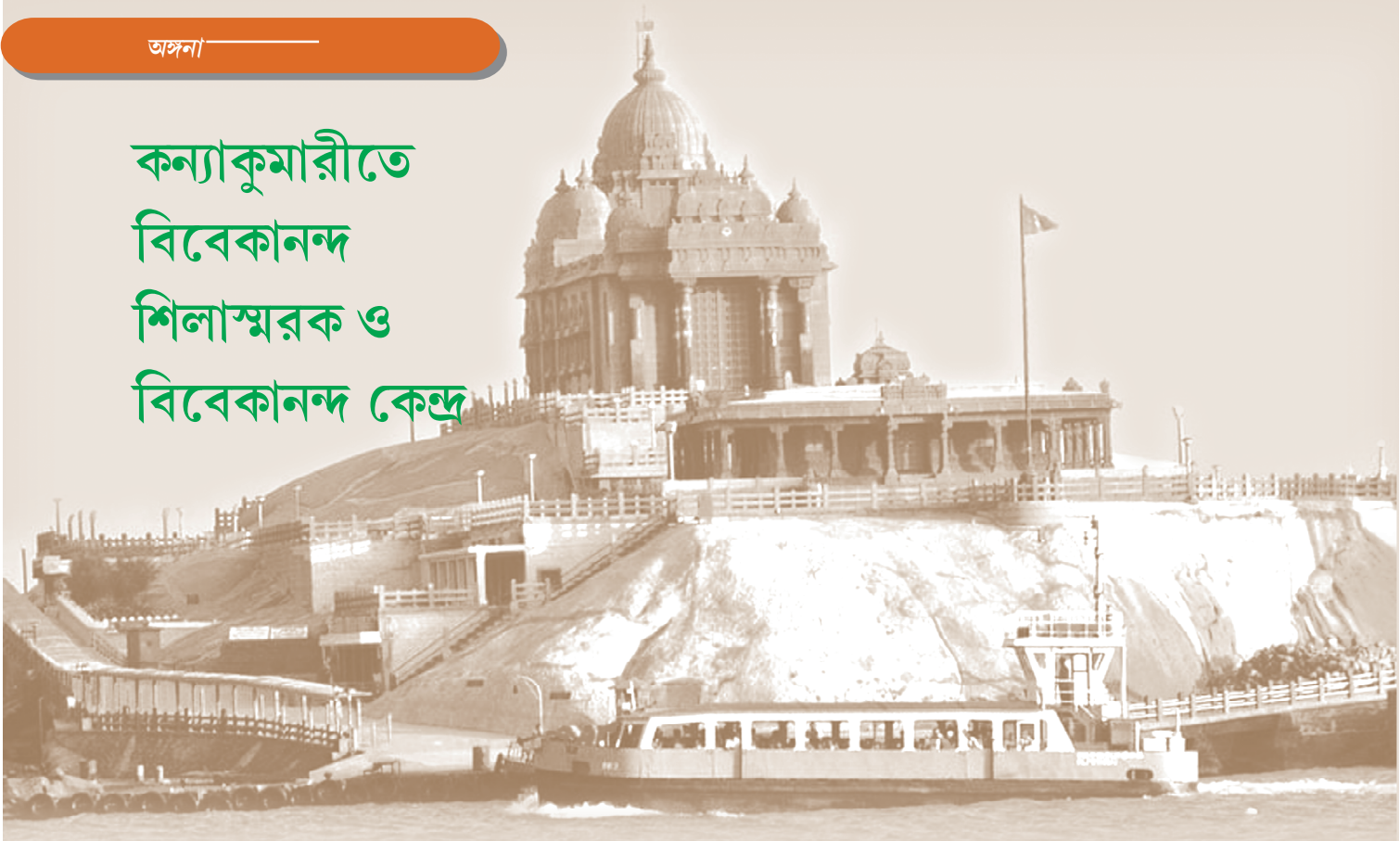
যদি হিন্দু ভোটারদের সময় নিয়ে সহজ ভাষায় এই ফেনোমেনা বোঝানো সম্ভব হয়, যাতে তারা মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত না হয়, তাহলে পরের ভোটে এনডিএ ৪০০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে, যদি বিজেপি ও সহযোগী দলগুলি একমত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। পাঁচ বছর বেশি সময় নয়, ইতিহাস থেকে হিন্দুরা শিক্ষা গ্রহণ করুক।

—মৃণাল মজুমদার,
বার্লিন, জার্মানি।

With Best Compliments from-

A
Well Wisher

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলাস্মরক ও বিবেকানন্দ কেন্দ্র



সুতপা বসাক ভড়

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তটি হলো বঙ্গোপসাগর, ভারতমহাসাগর এবং আরব সাগর এই তিনটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। এই স্থানটি ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিচিত। এখানে স্নান করলে দেবী কন্যাকুমারীর আশীর্বাদে সর্বপাপক্ষয় হয়। পুরাণ অনুসারে, একদা বাণাসুর নামক এক অসুর দেবতাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। তার অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার আশায় দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। মহাবিশ্বের পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণু তাঁদের দেবী শক্তির আরাধনা করার পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যে দেবতারা যজ্ঞ করে দেবীকে আহ্বান জানালে দেবী একটি ছোটো কন্যারূপ ধারণ করে আবির্ভূতা হয়ে তাঁদের অভয় প্রদান করেন। তিনি ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে এসে মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য ধ্যানে মগ্ন হন।

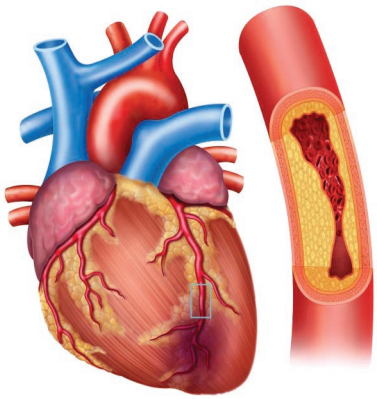
দেবীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বিয়ের সম্মতি দেন; কিন্তু ব্রহ্মার বরে কেবলমাত্র কুমারী কন্যার দ্বারাই বাণাসুরের মৃত্যু হবে, সেজন্য দেবর্ষি নারদের প্রচেষ্টায় বিয়েতে বিঘ্ন ঘটে। ভগ্নহৃদয়ে দেবী কুমারী আবার তপস্যা শুরু করেন। এদিকে বাণাসুর কন্যাকুমারীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। দেবী প্রত্যাখ্যান করলে দুজনের মধ্যে শুরু হয় ভয়ংকর যুদ্ধ। অবশেষে চক্রের দ্বারা দেবী কন্যাকুমারী বাণাসুরকে বধ করেন। মৃত্যুকালে অনুতপ্ত বাণাসুরের ক্ষমা প্রার্থনায় দেবী বরদান করেন যে এই তিন সমুদ্রের মিলনস্থলে স্নান করলে পাপক্ষয় হবে। তখন থেকে দেবী কুমারী একটি মালা ধারণ করে মহাদেবের তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন। আমাদের দেশের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েক মিটার দূরত্বে একটি বড়ো প্রস্তরখণ্ডে দেবী এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিলেন। ওই শিলাখণ্ডের ওপর এখনও পর্যন্ত তাঁর পদচিহ্ন বিরাজমান এবং নিত্য পূজিতা হন।

কন্যাকুমারীর শিলা একটি ঐতিহাসিক ক্ষেত্র রূপেও পরিচিত। এই শিলাখণ্ডেই ১৮৯২ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ সাধনায় মগ্ন হন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে তাঁর জীবনীকার ওই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই শিলাখণ্ডে ধ্যানের পর স্বামী বিবেকানন্দ রূপান্তরিত হন এক মহান বিপ্লবী, মহান সংগঠক এবং জাতিগঠনের প্রধান পুরোহিতরূপে জগদ্‌গুরুর ভূমিকায়।

১৯৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকার— শ্রীগুরুজীর আগ্রহে স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সমিতি এবং বিবেকানন্দ শিলাস্মারক সমিতির সংগঠন সম্পাদকরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন একনাথ রানাডে। শ্রীগুরুজীর প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। শ্রীগুরুজীর আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরম্পরার প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।

বিবেকানন্দ শিলাস্মারক নির্মাণের পুণ্যকার্যে তিনি অনুভব করেন যে, কোনো জাতি তার অর্ধাংশ অর্থাৎ মহিলাদের উপেক্ষা করে তৈরি হতে পারে না, সেজন্য রাষ্ট্র গঠনের মতো ক্ষেত্রে মহিলাদের যোগদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। একনাথজীর স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি, নিখুঁত পরিকল্পনা অনুপ্রেরণাদায়ী প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ পেয়েছে বিবেকানন্দ শিলাস্মারক।

২ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে একনাথ রাণাডে, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরনন্দজীর পূতস্পর্শে বিবেকানন্দ শিলাস্মারক জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। ৭ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ কেন্দ্র। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সেবাযজ্ঞে শত শত মহিলা সেবাব্রতী হিসেবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বর্তমানে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে নিরন্তর, নিঃশব্দে নিবেদিতা ভিড়ে তাঁর কল্যাণময়ী স্পর্শের দ্বারা ভারতব্যাপী সেবাকাজের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। □



কোলেস্টেরল ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কোলেস্টেরল রক্তে মিশে থাকে এবং রক্তনালী দিয়ে সারা শরীরে চলাচল করে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ রক্ত থেকে এই কোলেস্টেরল সংগ্রহ করে হরমোন ও প্রয়োজনীয় উৎপাদন তৈরি করে। সুতরাং কোলেস্টেরল শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যা নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকা প্রয়োজন। তবে পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হলে তা রক্তনালীতে জমে যায়। তখন রক্তনালী সরু হয়ে গিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। হার্টের রক্তনালী জমে গেলে বুকে ব্যথা বা হার্ট অ্যাটাক, মস্তিষ্কের রক্তনালীতে জমলে স্ট্রোক, কিডনির রক্তনালিতে জমলে কিডনি ফেলিয়োর— এ রকম অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কোলেস্টেরলের রকমফের : এলডিএল, এইচডিএল, ট্রাইগ্লিসারাইড হলো এর শ্রেণীবিভাগ। এলডিএল হলো শরীরের জন্য সবচেয়ে খারাপ কোলেস্টরল, যা রক্তনালীতে জমে বেশি। এইচডিএল শরীরের জন্য ভালো কোলেস্টেরল, যা রক্তনালীতে চর্বি জমতে দেয় না, আর ট্রাইগ্লিসারাইড রক্তে বেশি থাকলে অগ্ন্যাশয়ের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। রক্তে বেশি মাত্রায় কোলেস্টেরলের উপস্থিতি বংশগত কারণে হয়, আবার আয়েশি জীবনযাপন পদ্ধতিকেও এর জন্য দায়ী করা হয়।

নিরাপদ মাত্রা : সর্বমোট কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ১৭০ মিলিগ্রামের নীচে, এলডিএল কোলস্টেরল ডেসিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের নীচে, ট্রাইগ্লিসারাইড ডেসিলিটারে ১৫০ মিলিগ্রামের নীচে থাকা ভালো। আবার ভালো কোলেস্টেরল এইচডিএলের মাত্রা ডেসিলিটারে ৪০ মিলিগ্রামের ওপর থাকা ভালো।

নিয়ন্ত্রণের উপায় : দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভ্যাস পরিবর্তন এবং ওষুধ সেবনের মাধ্যমে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন : এ জন্য খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফলের পরিমাণ বাড়াতে হবে। আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া, বিশেষ করে খোসা-সহ সবজি খাওয়া ভালো।

● খাদ্যতালিকা থেকে প্রাণীজ চর্বি যেমন— খাসির মাংস, মুগির চামড়া, কলিজা, মগজ, মাছের ডিম, ডিমের কুসুম, চিংড়ি ইত্যাদি বাদ দিতে হবে।

● রান্নায় যথাসম্ভব কম তেল ব্যবহার করতে হবে। তেলে ভাজা খাবার কম খেতে হবে। ভাপে সিদ্ধ, গ্রিলড খাবার খাওয়া অভ্যাস করতে হবে।

● ঘি-মাখন, পনির, ড্রেসিং সস, মেয়োনিজ খাওয়া অভ্যাস বাদ দিতে হবে।

● রিফাইন্ড খাবার বাদ দিয়ে 'সুপাচ্য' খাবার খেতে হবে (যেমন— জুসের বদলে ফল, ভুসি-সহ লাল আটা ইত্যাদি)।

● নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে।

● প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০ মিনিট করে সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন দ্রুত হাঁটতে হবে।

● বাড়ির টুকটাক কাজ নিজে করার অভ্যাস করতে হবে।

● কাছাকাছি জায়গায় রিকশা না নিয়ে হেঁটে যাওয়া, লিফটে না গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে হাঁটার অভ্যাস করা যেতে পারে।

● ধূমপান বা তামাকের ব্যবহার ছেড়ে দিতে হবে। ওষুধের মাধ্যমে জীবনযাত্রার অভ্যাস পরিবর্তনের দু-তিন মাস পরও যদি রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি জীবনযাত্রার অভ্যাসগুলো মানতে হবে। মনে রাখতে হবে, যাদের কোলেস্টেরলের প্রবণতা আছে, তাদের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা অন্যদের চেয়ে অনেক কঠিন।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে খাবার : রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে খাবারদাবারে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। এজন্য কিছু করণীয় ও বর্জনীয় হলো—

বর্জন করতে হবে : আইসক্রিম, পোলাও, বিরিয়ানি, ননিযুক্ত দুধ, মাছের ডিম, ডিমের কুসুম, চর্বিজাতীয় খাবার, পনির, ঘি, মাখন, রেডমিট (খাসির মাংস), চিংড়ি, পরোটা, লুচি, চিপস, চকোলেট মেয়োনিজ, কেক, পেস্ট্রি, সস, জ্যাম, জেলি, কলিজা, সফট ড্রিংকস বর্জন-সহ মদ্যপান, ধূমপান পরিহার করতে হবে।

গ্রহণ করতে হবে : শস্য : ওটস, বার্লি, ভুট্টা, লাল আটার রুটি।

ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড জাতীয় খাবার : যেমন ক্যানোলা, সানফ্লাওয়ার, জলপাইয়ের তেল, অ্যাভোকাডো ইত্যাদি।

সাইট্রাস বা ভিটামিন 'সি' জাতীয় ফল : আপেল, কমলালেবু, বাতাবি লেবু, কাগজি লেবু, জাম্বুরা, স্ট্রবেরি, ক্র্যানবেরি, ব্ল্যাকবেরি, আঙুর, ন্যাশপাতি, জলপাই, আমলকি। বিটা ক্যারোটিন যুক্ত খাবার গাড় সবুজ শাকসবজি যেমন— বাঁধাকপি, ব্রকোলি ইত্যাদি। এবং গাঢ় হলুদ সবজি ও ফল যেমন কুমড়ো, মিষ্টি আলু, গাজর, আম কাঁঠাল ও হলুদ পিচ ফল। বীজজাতীয় খাবার যেমন— শিমের বিচি, মটরশুঁটি, ছোলা। বাদাম বিশেষ করে কাঠবাদাম, কাজুবাদাম ও ওয়ালনাট। এছাড়াও খেতে হবে সয়াবিন ও সয়াদুধ, সামদ্রিক মাছ, রসুন, আপেল, সাইডার ভিনেগার, গ্রিন টি, ডার্ক চকোলেট, ফ্যাটফ্রি দুধ, টকদই ইত্যাদি।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : আমি দীর্ঘ ৩৫ বছর চিকিৎসা জীবনে অসংখ্য রোগীর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে কোলেস্টেরল মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। যে সমস্ত ওষধগুলোতে বেশি কাজ পেয়েছি সেগুলি হলো— গুলথোরিয়া গ্লুমেরি, গ্লাইসোরিয়া গ্লোব, ম্যানথা-পি, ফ্যালট্যাওরি প্রভৃতি। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। □

ইতিহাস গড়ে টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ করলেন নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ইতিহাস সৃষ্টি করলেন নরেন্দ্র মোদী। হ্যাটট্রিক করে নয়াদিল্লিতে ফের প্রতিষ্ঠিত হলো বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। আসন সংখ্যার বিচারে শাসক জোট এনডিএ-তে বিজেপি একক বৃহত্তম দল। আধুনিক পরিভাষায় গত ৯ জুন (রবিবার) গঠিত হলো 'মোদী ৩.০' সরকার। রাষ্ট্রপতি ভবনে এই দিন সন্ধ্যা ৭.২৩ মিনিটে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীকে শপথবাক্য পাঠ করালেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ছিলেন নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডু-সহ এনডিএ শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব।

মন্ত্রগুপ্তির শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বের তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা হলো। ছুঁয়ে ফেললেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ড। ১৯৬২ সালে টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন নেহরু। ৬২ বছর পর সেই রেকর্ড স্পর্শ করলেন বারাণসীর সাংসদ নরেন্দ্র মোদী। এদিন মোদীজীর পরনে ছিল সাদা কুর্তা পাজামা ও গায়ে নীল রঙের জহর কোট। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করবেন।

এদিন রাইসিনা হিলসে ছিল চাঁদের হাট। শাহরুখ খান, অক্ষয় কুমার-সহ বলিউডের একঝাঁক তারকা উপস্থিত ছিলেন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। দেশের দুই প্রখ্যাত শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি সপরিবারে ছিলেন সেখানে। মোদীজীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে এদিন পরপর শপথ নেন রাজনাথ সিংহ, অমিত শা, নির্মলা সীতারমন, অশ্বিনী বৈষ্ণব, জে পি নাড্ডা, নীতিন গড়করি, ড. এস. জয়শঙ্করের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন নতুন মুখ। তবে পুরনো টিমেই যে মোদীজী ভরসা রাখছেন, তা বোঝা গিয়েছে মন্ত্রীদের তালিকা দেখেই।



পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঠাঁই পেয়েছেন বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর।

টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার আগে রবিবার সকালে মহাত্মা গান্ধী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মোদীজী। এরপর বাজপেয়ীজীর স্মৃতিসৌধ 'সদৈব অটল'-এর কাছে গিয়েও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মোদীজী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজনাথ সিংহ। সেখান থেকে 'ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল'-এ গিয়েও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মোদীজী। প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালের মে মাসে অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণী ও প্রমোদ মহাজনের হাত ধরে গঠিত হয়েছিল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ।

এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরুর আগে নতমস্তকে সবাইকে প্রণাম করেন মোদীজী। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আট হাজারের বেশি অতিথি। ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহাল, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহে, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ কুমার জগন্নাথ, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ও সেশেলসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আহমেদ আরিফ। বহু দেশের প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে একেবারে সামনের সারিতেই দেখা গিয়েছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগের মতোই স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অর্থ ও বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে অমিত শা, রাজনাথ সিংহ, নির্মলা সীতারামন ও ড. এস. জয়শঙ্করকে।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য দিল্লি পুলিশের প্রায় ১,১০০ ট্রাফিক কর্মীকে মোতায়েন করা হয়। নিরাপত্তার জন্য বসানো হয়েছিল পাঁচশোর বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা। গোটা অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। দিল্লি পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি ছিলেন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডোরা। শপথ গ্রহণ যেখানে হয়েছে সেই ভিতরের স্তরে ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক ও এসপিজি বাহিনী। রাষ্ট্রপতি ভবন-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা করা হয়। সকাল থেকেই আকাশে চক্কর দিতে দেখা যায় বায়ুসেনার একাধিক হেলিকপ্টারকে। সদ্য শপথ নেওয়া ৭২ জন মন্ত্রীর হাতে শীঘ্রই বিভিন্ন মন্ত্রকের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে।



২০২৪ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলের বিভিন্ন দিক

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন পর্যন্ত মোট ৭টি দফায় ভারতে লোকসভার ১৮তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গত ৪ জুন তারিখে হয় ভোট গণনা ও এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। গত ১ জুন বিকেল থেকেই জাতীয়, আঞ্চলিক ও রাজ্য স্তরের নানা টেলিভিশন নিউজ ও ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারিত হতে থাকে এক্সিট পোল। সমস্ত এক্সিট পোলের ফলাফলের পর্যালোচনা অনুযায়ী এই নির্বাচনে আসন সংখ্যার বিচারে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) যে একক বৃহত্তম দল হতে চলেছে তা ছিল একপ্রকার নিশ্চিত। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বিপুল জয়ও ছিল প্রত্যাশিত। ৪ তারিখ ফলাফলে সম্পূর্ণভাবে না হলেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। দেশের একক বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপি পেয়েছে ২৪০টি আসন। ৯৯টি আসন পেয়ে কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দলের তকমা পেয়েছে। ৪ তারিখের ফলাফলের বিচারে প্রাথমিকভাবে এনডিএ জোটের আসন সংখ্যা ২৯২টি হলেও গত ৫ জুন এনডিএ জোটের বৈঠকের পরে এনডিএতে কয়েকজন জয়ী নির্দল ও কয়েকটি আঞ্চলিক দলের যোগদানের ফলে এনডিএ-র আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৩। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভায় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ২৭২ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ২৯টি, বিজেপি ১২টি ও কংগ্রেস একটি আসনে জয়ী হয়েছে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ২২টি, বিজেপি ১৮টি ও কংগ্রেস দুটি আসন পেয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে এই নির্বাচনে তৃণমূলের ৭টি আসন বৃদ্ধি এবং বিজেপির ৬টি আসন হ্রাসের হিসাব চোখে পড়লেও ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও চুলচেরা বিচার করলে উঠে আসে একটি ভিন্নধর্মী চিত্র। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের পর ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে তৃণমূল ২১৫টি এবং বিরোধী দল বিজেপি ৭৭টি আসনে জয়লাভ করে। রাজ্য জুড়ে ভোটদানের হারের শতকরা হিসাব ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন ও ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রায় এক। বিগত নির্বাচনগুলির মতো এই নির্বাচনেও রাজ্যের শাসক দলের তরফে বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে বুথ দখল, বিরোধী দলের এজেন্ট বসতে না দিয়ে অবাধে ছাপ্পাভোট, বিরোধী দলের প্রার্থীকে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিয়ে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দান-সহ সব রকম কারচুপি ও জালিয়াতির ছবি ভোট গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে সামনে আসে। কিছু এলাকায় ভোটিং ও কাউন্টিঙের বিভিন্ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার দরুন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাজ্যের শাসক দলের ও আইপ্যাকের প্রভাব খাটানোর মতো ঘটনাও প্রকাশ্যে আসে।

২০২১ সালে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল পায় ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৮১টি ভোট। আর এই বছর লোকসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যে তৃণমূল পেয়েছে মোট ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৩৩টি ভোট। অর্থাৎ ভোটপ্রাপ্তির বিচারে ২০২১-এর তুলনায় তৃণমূল এবার ১২ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৪৮টি ভোট কম পেয়েছে।

২০২১ সালে সংঘটিত বিধানসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপি পায় ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৫ হাজার ৪৭৪টি ভোট। আর এই বছর লোকসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যে বিজেপি পেয়েছে মোট ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৮১টি ভোট। অর্থাৎ ভোটপ্রাপ্তির বিচারে ২০২১-এর তুলনায় বিজেপি এবার বেশি পেয়েছে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০৭টি ভোট।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এই সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল পেয়েছে মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৬ শতাংশের কিছু বেশি। অর্থাৎ এই রাজ্যে প্রায় ৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে প্রায় ৩৮ শতাংশ ভোট। তৃণমূল-বিরোধী ভোট সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীভূত হলে তৃণমূল ধরাশায়ী হতো ৩২টি আসনে। নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী এটা পরিষ্কার যে বিরোধী ভোট বিভাজনে লাভবান হয়েছে তৃণমূল। শাসক বিরোধী ভোটটা ভাগ হওয়াই তৃণমূলের এই ২৯টি আসন জয়ের আসল চাবিকাঠি। ভোট বিভাজন করে তৃণমূলের এই সাফল্যের পেছনে পরোক্ষ কৃতিত্ব ইন্ডি জোটে তৃণমূলের সহযোগী দল সিপিএম ও কংগ্রেসের। এই দলগুলিই ২০২১ সালে পরোক্ষে তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 'নো ভোট টু বিজেপি' প্রচার চালিয়েছিল। এরা কখনোই 'নো ভোট

টু টিএমসি' বলে কোনো প্রচার চালায়নি। হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলিতে বিজেপি-বিরোধী প্রচার চালালেও, এরা মুসলমান সংখ্যাধিক্যের এলাকাগুলিকে টিএমসি বিরোধী প্রচারের বাইরে রাখে। এই দলগুলির পরোক্ষ সহযোগিতায় ২০২১ ও ২০২৪-এ আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তৃণমূল কংগ্রেস সাফল্যের মুখ দেখে। তৃণমূলের বি-টিম এই বামপন্থীদের টার্গেট ছিল হিন্দুদের ভোট কেটে বিজেপিকে হারানো আর সব মুসলমান ভোট তৃণমূলে ফেলানো। বিগত নির্বাচনগুলির মতো এই নির্বাচনেও অধিকাংশ আসনে বাম-কংগ্রেস প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়েছে, কিন্তু তাদের তরফে প্রার্থী দেওয়ার ফলে বিরোধী ভোট ভাগ হয়েছে, লাভবান হয়েছে তৃণমূল। নিজেদের নাক কেটে তাদের ইন্ডি জোটের সহযোগী তৃণমূলকে ভোট বৈতরণী পার হতে এই যাত্রায় তারা ফের সাহায্য করল।

বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই নির্বাচনের পশ্চিমবঙ্গ-কেন্দ্রিক ফলাফল বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূলের ভোট কমেছে, বিজেপির ভোট বেড়েছে। ২০২১-এর নির্বাচন থেকে মাঝে ২০২৩-এর রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং এই বছর লোকসভা নির্বাচনের পর পর্যন্ত লাগামহীন তৃণমূলি সন্ত্রাসে প্রায় ২০০ জন বিজেপি কর্মী, সমর্থক প্রাণ হারিয়েছেন, অসংখ্য মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন, তৃণমূলি সমাজবিরোধীদের দ্বারা অগণিত মহিলা হয়েছেন ধর্ষণের শিকার। রাজ্যে আইনের শাসন নয়, বলবৎ হয়েছে শাসকের আইন। এই বছরও গত ৪ জুন ফলপ্রকাশের দিন থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে ভোট পরবর্তী হিংসা বা পোস্ট পোল ভায়োলেন্সের খবর। গত জানুয়ারি থেকে এই ১ জুন পর্যন্ত সন্দেশখালি জুড়ে মহিলাদের বিক্ষোভ-আন্দোলন দমনে ব্যাপক পুলিশি সন্ত্রাস ও তৃণমূলি হার্মাদ, জেহাদিদের আক্রমণের সাক্ষী থেকেছে পশ্চিমবঙ্গ। সেই সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের পর্যন্ত গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে মিথ্যে মামলা। গত ৪ জুনের পর সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, বসিরহাট, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, নদীয়ায় উঠে এসেছে ভয়াবহ নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের চিত্র। শাসকের পেশিশক্তি প্রয়োগ, বিরোধী দলের কার্যালয় বা পার্টি অফিসে আক্রমণ, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি-ঘর, দোকানে লুঠ ও অগ্নিসংযোগ, মা-বোনেদের সম্ভ্রমহানির মুহুর্মুহু ব্রেকিং নিউজে উত্তাল হয়েছে টেলিভিশনের স্ক্রিন। উত্তরবঙ্গেরও নানা স্থানে পরিস্থিতি হয়েছে উত্তপ্ত। কলকাতার ট্যাংরাতেও তৃণমূলি হার্মাদদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি কর্মী। তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের এই অত্যাচার, প্রশাসনিক নীরবতা-নিষ্ক্রিয়তার ফলে বিভিন্ন জেলায় পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। বহু বছর ধরে এই রাজ্যে খোঁড়া হয়েছে গণতন্ত্রের কবর! বামফ্রন্ট জমানায় ৩৪ বছর এবং তৃণমূলের রাজত্বের এই ১৩ বছরে প্রতিটি ভোটের পর এই সন্ত্রাসের নিন্দনীয় ধারাবাহিকতা দেখে এস. ওয়াজেদ আলির লেখা 'ভারতবর্ষ' নামক ছোটগল্পের সেই লাইনটি মনে পড়ে যায়— 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে!'

বিভিন্ন বাংলা টিভি নিউজ চ্যানেলের আলোচনা ও বিতর্কসভায় রাজ্য সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের সাফল্যকে তৃণমূলের ২৯টি আসন জয়ের পিছনে ক্রিয়াশীল একটি অন্যতম কারণ হিসেবে প্রচার করার একটি ট্রেন্ড চলছে। এই প্রকল্পে সম্প্রতি ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১,০০০ টাকা এবং এক হাজার টাকা বাড়িয়ে ১,২০০ টাকার ইস্যুটিকেও তৃণমূলি সাফল্যের কারণ বলে অনেকেই দাবি করেছে। এই প্রকল্পে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলাদের এই অর্থ প্রদান করে রাজ্য সরকার। শাসক দলের দাবি অনুযায়ী, বিভিন্ন জেলায় দুয়ারে সরকারের দ্বারা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সার্বিক রূপায়ণেই মহিলারা এবং এই অর্থের দ্বারা উপকৃত পরিবারগুলির ভোটেই তাদের এই রাজনৈতিক সাফল্য। প্রশ্ন হলো, 'সার্বিক রূপায়ণ'-ই যদি হবে, তবে তৃণমূলের ৪৬ শতাংশ ভোট পাওয়ার কারণ কী? পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ৫৪ শতাংশ ভোটদাতার তৃণমূলের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণ কী? ক্ষমতা দখলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো ভাতা বা দানখয়রাতি নির্ভর প্রকল্পই কি অপরিহার্য? ভাতা আর অনুদানেই যদি এত শক্তি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ১২টি লোকসভা আসনে টিএমসি পরাজিত কেন? সেখানেও তো ভাতা-অনুদান সব কিছুই ছিল। কোনো কাজে এলো! ২০২১-এ ৭৭টি বিধানসভা আসনে জেতে বিজেপি। এই নির্বাচনের ফল অনুযায়ী রাজ্যের ৯০টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এত ভাতা-অনুদান ছড়িয়ে, রিগিং করেও ভোট পার্সেন্টেজ ধরে রাখতে ব্যর্থ টিএমসি।

২০২১-এর তুলনায় ২০২৪-এ তৃণমূলের ভোটপ্রাপ্তিই-বা কম কেন? এত সন্ত্রাস, ভীতিপ্রদর্শন, বিভিন্ন ভাতা-অনুদানের প্রলোভন সমেত ডোল-পলিটিক্সের রমরমা সত্ত্বেও এই নির্বাচনে বিজেপির ভোট বাড়লো কীভাবে? তৃণমূলের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, ঘুষের মাধ্যমে চাকরি ও পরিষেবা বিক্রি, গোরু, বালি, কয়লা, রেশন, আমফানের টাকা, চাল, ত্রিপল, চাকরি চুরি, সিন্ডিকেট-রাজ, ব্যাপক রাজনৈতিক সন্ত্রাস, খুন ও ধর্ষণের রাজনীতি, শিক্ষা দুর্নীতি, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, বেআইনি অনুপ্রবেশে মদত, নির্লজ্জ জেহাদি তোষণ, এমনকী সাধুসন্তদের ওপর আক্রমণের কারণে কি এই রাজ্যের ৫৪ শতাংশ মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন?

প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবে উঠলেও টিভি মিডিয়া এর উত্তর সন্ধানে নিরুত্তর। দানখয়রাতি-ভিত্তিক কোনো সরকারি প্রকল্প মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলে না। এই টাকা দেওয়া হয় মানুষকে ভিখারি বানাতে। রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সারা বছর নির্ভরশীল থাকতে। রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, সেই সম্পদের প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় সরকারি সহযোগিতায় নানা প্রকল্প ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে এবং রাজ্যের বিবাহিতা-অবিবাহিতা মহিলাদের সেই স্থানে নিয়োগ করলে তাদের কিন্তু এক হাজার টাকার পরিবর্তে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা অবধি দেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও পরিকাঠামো উন্নয়ন-কেন্দ্রিক অর্থনীতির মডেল অনুসরণের পক্ষপাতী নয় এই রাজ্য। উন্নয়নের নামে এই রাজ্যে চলে 'politics of entitlement'। 'politics of empowerment'-এর কোনো স্থান এই রাজ্যে নেই। সরকারি অর্থব্যয়ে ভোট কেনা বর্তমান সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এসব সত্ত্বেও শতাংশের হিসাবে ভোট আদায়ে তারা ১০০ শতাংশ নয়, ৪৬ শতাংশ সফল। তাই ভোট প্রাপ্তিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার গুরুত্বপূর্ণ হলেও শেষ কথা নয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের রূপায়ণের পরেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদা তার ভোটদান, তৃণমূলের ভোট হ্রাস, সন্ত্রাস সত্ত্বেও বিজেপির ভোট বৃদ্ধি সেই ইঙ্গিতই বহন করে।

ভারতের মতো দেশে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণের অধিকার কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের রয়েছে। কিন্তু কর্মক্ষম মহিলাদের কাজের ব্যবস্থা না করে প্রতি মাসে ভাতা প্রদান, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো সৃষ্টিতে জোর না দিয়ে উৎসব-পার্বণে সরকারি অর্থের অপব্যবহার, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে খুশি করার লক্ষ্যে ইমাম-মোয়াজ্জেম ভাতার ঘোষণা এই রাজ্যের অর্থনীতিকে দুর্বল ও পঙ্গু করবে, প্রকারান্তরে বাড়বে রাজ্যের দেনা। ঋণভারে জর্জরিত এই রাজ্য উন্নয়ন মূলক প্রকল্প রূপায়ণ, এমনকী সরকারি

২০২৪ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের

কোচবিহার
জয়ী— জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৮৮,৩৭৫
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৪৯,১২৫
ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রাপ্ত ভোট : ৩০,২৬৭

আলিপুরদুয়ার
জয়ী— মনোজ টিগ্গা
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৯৫,৩১৪
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,১৯,৮৬৭
আরএসপির প্রাপ্ত ভোট : ৩৯,৭০৯

জলপাইগুড়ি
জয়ী— ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৬৬,৫৬৮
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৯,৮৭৫
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,০৯২

দার্জিলিং
জয়ী— রাজু বিস্তা
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৯,৩৩১
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,০০,৮০৬
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,৩৭৪

রায়গঞ্জ
জয়ী— কার্তিকচন্দ্র পাল
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৬০,৮৯৭
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৯২,৭০০
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ২,৬৩,২৭৩

বালুরঘাট
জয়ী— ড. সুকান্ত মজুমদার
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৪,৯৯৬
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৬৪,৬১০
আরএসপির প্রাপ্ত ভোট : ৫৪,২১৭

মালদহ উত্তর
জয়ী— খগেন মুর্মু
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,২৭,০২৩
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৪৯,৩১৫
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৩,৮৪,৭৬৪

মালদহ দক্ষিণ
জয়ী— ইশা খান চৌধুরী
জয়ী কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭২,৩৯৫
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৪৪,০২৭
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৩,০১,০২৬

জঙ্গিপুর
জয়ী— খলিলুর রহমান
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৪৪,৪২৭
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৪,২৭,৭৯০
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৪০,৮১৪

বহরমপুর
জয়ী— ইউসুফ পাঠান
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,২৪,৫১৬
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৪,৩৯,৪৯৪
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৭১,৮৮৫

মুর্শিদাবাদ
জয়ী— আবু তাহের খান
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৮২,৪৪২
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৫,১৮,২২৭
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ২,৯২,০৩১

কৃষ্ণনগর
জয়ী— মহুয়া মৈত্র
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,২৮,৭৮৯
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭২,০৮৪
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,৮০,২০১

রাণাঘাট
জয়ী— জগন্নাথ সরকার
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৮২,৩৯৬
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৯৫,৪৯৭
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,২৩,৮১০

বনগাঁ
জয়ী— শান্তনু ঠাকুর
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,১৯,৫০৫
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৪৫,৮১২
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৬৫,১৭৬

ব্যারাকপুর
জয়ী— পার্থ ভৌমিক
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,২০,২৩১
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৫৫,৭৯৩
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,০৯,৫৬৪

দমদম
জয়ী— সৌগত রায়
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,২৮,৫৭৯
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৫৭,৯১৯
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ২,৪০,৭৮৪

বারাসত
জয়ী— ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৯২,০১০
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৭,৮২১
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ১,২১,৪৪০
ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রাপ্ত ভোট : ১,০০,০০০

বসিরহাট
জয়ী— শেখ নুরুল ইসলাম
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৮,০৩,৭৬২
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৭০,২১৫
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ১,২৩,৫০০
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,৮৯৯

জয়নগর
জয়ী— প্রতিমা মণ্ডল
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৮,৯৪,৩১২
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,২৪,০৯৩
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ৬৫,৩৭২
আরএসপির প্রাপ্ত ভোট : ৪০,১১৩
এসইউসির প্রাপ্ত ভোট : ১৪,৬২২

মথুরাপুর
জয়ী— বাপি হালদার
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৫৫,৭৩১
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৫৪,৬৭৪
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,৬০৬
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৬১,১০০

ডায়মন্ড হারবার
জয়ী— অভিষেক ব্যানার্জি
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ১০,৪৮,২৩০
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৩৭,৩০০
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,৯৫৩
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ২১,১৩৯

যাদবপুর
জয়ী— সায়নী ঘোষ
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,১৭,৮৯৯

৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল একনজরে

বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৫৯,৬৯৮
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ২,৫৮,৭১২
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,৩৬২

কলকাতা দক্ষিণ
জয়ী— মালা রায়
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,১৫,২৭৪
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,২৮,০৪৩
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,৬৮,৫৩১

কলকাতা উত্তর
জয়ী— সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৫৪,৬৯৬
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৩,৬২,১৩৬
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৯৮২

হাওড়া
জয়ী— প্রসূন ব্যানার্জি
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,২৬,৪৯৩
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৫৭,০৫১
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,৫২,০০৫

উলুবেড়িয়া
জয়ী— সাজদা আহমেদ
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,২৪,৬২২
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,০৫,৯৪৯
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৫৮৯
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ৩৮,৯৯১

শ্রীরামপুর
জয়ী— কল্যাণ ব্যানার্জি
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৩,৯৭০
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৪,৯৯,১৪০
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ২,৩৯,১৪৬
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ২৫,৬৭৭

হুগলি
জয়ী— রচনা ব্যানার্জি
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,০২,৭৪৪
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,২৫,৮৯১
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৯,৯১৯

আরামবাগ
জয়ী— মিতালি বাগ
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,১২,৫৮৭
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,০৬,১৮৮
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৯২,৫০২

তমলুক
জয়ী— অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৬৫,৫৮৪
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৮৭,৮৫১
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৮৫,৩৮৯
আইএসএফের প্রাপ্ত ভোট : ১২,৩৩৯

কাঁথি
জয়ী— সৌমেন্দু অধিকারী
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৬৩,১৯৫
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,১৫,৪৩১
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ৩১,১২২

ঘাটাল
জয়ী— দীপক অধিকারী (দেব)
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৮,৩৭,৯৯০
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৫৫,১২২
সিপিআইয়ের প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,৯০৮

ঝাড়গ্রাম
জয়ী— কালীপদ সোরেন
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,৪৩,৪৭৮
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৬৯,৪৩০
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,৩০২

মেদিনীপুর
জয়ী— জুন মালিয়া
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,০২,১৯২
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৫,০০১
সিপিআইয়ের প্রাপ্ত ভোট : ৫৭,৭৮৫

পুরুলিয়া
জয়ী— জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৭৮,৪৮৯
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৬১,৪১০
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ১,২৯,১৫৭
নির্দল (অজিত মাহাতো) ভোট : ৯৮,৬৫৮
ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রাপ্ত ভোট : ১৪,৫৭২

বাঁকুড়া
জয়ী— অরূপ চক্রবর্তী
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৪১,৮১৩
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,০৯,০৩৫
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৩৫৯

বিষ্ণুপুর
জয়ী— সৌমিত্র খাঁ
জয়ী বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৮০,১৩০
টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,৭৪,৫৬৩
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৪১১

বর্ধমান পূর্ব
জয়ী— ডাঃ শর্মিলা সরকার
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,২০,৩০২
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৫৯,৭৩০
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,৭৬,৮৯৯

বর্ধমান-দুর্গাপুর
জয়ী— কীর্তি আজাদ
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,২০,৬৬৭
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৮২,৬৮৬
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,৫৩,৮২৯

আসানসোল
জয়ী— শত্রুঘ্ন সিনহা
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৬,০৫,৬৪৫
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,৪৬,০৮১
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৯৬৪

বোলপুর
জয়ী— অসিত কুমার মাল
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৮,৫৫,৬৩৩
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,২৮,৩৮০
সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট : ৯৯,৩৮৩

বীরভূম
জয়ী— শতাব্দী রায়
জয়ী টিএমসির প্রাপ্ত ভোট : ৭,১৭,৯৬১
বিজেপির প্রাপ্ত ভোট : ৫,২০,৩১১
কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট : ২,২৬,২৬০

(তথ্যসূত্র : results.eci.gov.in)





কর্মীদের পাওনা মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানে অপারগ। এর কারণ হিসেবে সরকারের হাতিয়ার এই সব সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান। বড়ো-মাঝারি-ক্ষুদ্র সব শিল্পেরই সলিলসমাধি ঘটেছে এই রাজ্যে। জলাভূমি বুজিয়ে, বৃক্ষ নিধন করে, মাঠ দখল করে এই রাজ্যে চলছে রিয়েল এস্টেটের রাজত্ব। প্রোমোটিংকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে এই রাজ্য। কংক্রিটের জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে শহর, গ্রাম ও মফস্‌সল। পাশাপাশি চলছে মদ-লটারির রমরমা। ৮ হাজার স্কুল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে। চালু হয়েছে ২১ হাজার মদের দোকান। রাজ্যে বড়ো শিল্প বিলোপ পাওয়ায়, প্রতি বছর ঘটা করে শিল্প সম্মেলন সত্ত্বেও রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ না আসায় এবং অর্থনীতির বৃদ্ধি না ঘটায় সরকারি রাজস্ব সংস্থান অপ্রতুল। এর ফলে ঋণ ভারে ডুবে যাচ্ছে রাজ্য। মরিয়া হয়ে রাজস্ব সংগ্রহে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলছে ব্যাপক হারে কর ও শুল্ক আদায়। অন্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে পেট্রল-ডিজেলের দাম বেশি। প্রতি বছর ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে বিদ্যুৎ বিল। সম্প্রতি, রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রদত্ত বিদ্যুৎ পরিষেবার মাশুলের হার অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নেও এই সরকার ব্যর্থ ও উদাসীন। একের পর এক অস্ত্র ও বোমা কারখানায় বিস্ফোরণের পরেও পুলিশ-প্রশাসন সম্পূর্ণ নির্বিকার। বেআইনি কয়লা খাদান, পাথর খাদান, বালি খাদান, মাটি মাফিয়া, কাঠ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও এক শ্রেণীর 'অনুপ্রাণিত' সংবাদমাধ্যম এবং সরকারি বিজ্ঞাপনের লোভে বিক্রি হয়ে যাওয়া প্রচারযন্ত্রের দৌলতে মানুষের সামনে আনা হচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ন্যারেটিভ।

ভোটসর্বস্ব রাজনীতির চোরাগলিতে হারিয়ে যাওয়া এই রাজ্য এবং রাজ্যের শাসক দলের দুর্নীতিবাজ, চরিত্রহীন নেতা-নেত্রীরা এই রাজ্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব রকম অবক্ষয়, স্খলন ও পতনের জন্য দায়ী থাকবেন। সরকারি ও সরকার-পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকরি বিক্রি করে টাকা কামানো, দলীয় তহবিল ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলানোর মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছে অযোগ্য- অপদার্থদের। শিক্ষকরা সমাজের মেরুদণ্ড। দেশ ও জাতি গঠনে তাঁরাই মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকতা এমন একটা পেশা যা অন্য সব পেশার জন্ম দিয়ে থাকে। সেই শিক্ষকদের ওপর চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকার আজ দেগে দিয়েছে কঠিন প্রশ্নচিহ্ন! সংখ্যালঘু তোষণের লক্ষ্যে গৃহীত ওবিসি নিয়ম কানুন বেআইনি ও অসাংবিধানিক প্রমাণিত হওয়ায় বাতিল হয়েছে ৫ লক্ষেরও বেশি ওবিসি শংসাপত্র। ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-সহ প্রতিটি সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি ও অর্থ তছরুপ লাগামছাড়া। পুরসভা-পঞ্চায়েতগুলি এই সীমাহীন দুর্নীতির এক একটি কেন্দ্র। সরকারি খরচের নিয়মমতো অডিটে বাধা দেওয়াটাও এই সরকারের স্বভাব। রাজ্যে অগণিত বেকার ও কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে চলেছেন যে কলকাতা হাইকোর্টকে তিনি মানেন না। এই রাজ্যে এনআরসি তিনি করতে দেবেন না বলে একাধিক বার হুমকিও দিয়েছেন। বোমা-পিস্তলের ব্যবহার ও শাসন যন্ত্রের সীমাহীন অপব্যবহারের মাধ্যমে ভোট লুঠ করেছে টিএমসি। তাঁর অনুপ্রাণিত গুন্ডা ও মাফিয়া বাহিনী গত ৪ জুনের পর রাজ্য জুড়ে চালাচ্ছে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ত্রাস, রাজনৈতিক হিংসার মোড়কে জেহাদিদের দ্বারা হিন্দু নিপীড়ন। এই রাজ্যের গণতন্ত্র-প্রিয় সমাজ আগামীদিনে রাজ্য-রাজনীতির এই জটিল ঘূর্ণাবর্তের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করবে, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট নিয়ন্ত্রিত তদন্ত সঠিক গতি পাবে, রাজ্যের দুর্নীতি দমনে বিচার বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা নেবে এবং তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার যথাসময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে— শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই এই আশা রাখে।



দুর্গাপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের শুভারম্ভ

গত ২৭ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (সাধারণ)-এর শুভারম্ভ হলো দুর্গাপুরে এ জোনস্থিত এম পি হাই স্কুলে। বর্গের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন দুর্গাপুর গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ স্বামী ভক্তিবেদান্ত নেমি মহারাজ, সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে মধ্যবঙ্গ প্রান্তের ১৫টি জেলা থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে মোট ২২৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে ৪৬ জন স্কুল ছাত্র, ২৪ জন কলেজ ছাত্র, ১৬ জন স্নাতক, ১৩ জন স্নাতকোত্তর, ১১ জন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র, ৪০ জন ব্যবসায়ী, ২৫ জন কৃষক, ৩২ জন শিক্ষক/অধ্যাপক এবং ১৫ জন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। উদ্বোধনী বৌদ্ধিক রাখেন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল।





অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২ জুন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের (বিদ্যালয় শিক্ষা) কোচবিহার জেলার বার্ষিক সাধারণ সভা কোচবিহার শহরের বিবেক তীর্থ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক, রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক অসীম দাস, রাজ্য সম্পাদক বিদ্যুৎ মজুমদার, রাজ্য সমিতির সদস্য দেবাদিত্য মণ্ডল এবং বিভাগ প্রমুখ অচিন্ত্য কুমার দাস। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার বিভাগ সঙ্ঘচালক সুশীল কুমার বিশ্বাস। সভায় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ১৬০ জন প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিতে শিক্ষকদের ভূমিকা, জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০ ইত্যাদি বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়। বিগত বছরের কাজের সমীক্ষা এবং আগামী বছরের কাজের যোজনা করা হয়। সাংগঠনিক কাজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা সমিতি গঠন করা হয়। নবগঠিত জেলা সমিতিতে সভাপতি হিসেবে তপন ভৌমিক, সম্পাদক মানস কর এবং কোষাধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার নির্বাচিত হন।



সিউড়ীতে শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের সমাজসেবী সংগঠন শ্রদ্ধার উদ্যোগে গত ২ জুন সিউড়ী শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে করমশাল গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিদুর মণ্ডল মহাশয়কে ১৪৯তম শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সংস্থার সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীমণ্ডল মহাশয়ের পূজা করেন তাঁর বড়ো পুত্রবধূ বেলি মণ্ডল। মাল্যদান করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রীমণ্ডল মহাশয়কে উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নীরদবরণ ঘোষ, শ্রীকান্ত ঘোষ, অমর দে এবং বিশ্বনাথ দে। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, সহযোগিতা করেন সুজাতা বিষ্ণু। শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। কীর্তন পরিবেশন করেন সন্তোষ ও বেণুকর মণ্ডল এবং তাদের সম্প্রদায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।



বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বাকুড়া নগরের স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে পাঞ্চজন্য ভবন পরিসর এবং সতীঘাটে বৃক্ষরোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831



স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ‘শিবাজী উৎসব’

ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য

‘শিবাজী উৎসব’— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগণিত কবিতার মধ্যে একটি অতি বিখ্যাত কবিতা যা তিনি ১৯০৪-এর আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে (১১ ভাদ্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ) গিরিডিতে বসে লিখেছিলেন এবং সেই কবিতা শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে পরের মাসে অর্থাৎ আশ্বিন, ১৩১১-তে ভারতী ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতার মধ্যে দেশপ্রেম, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং স্বদেশী আন্দোলনের উষালগ্নে জাতীয়তাবোধ ও ঐক্য উদ্বোধনের প্রেরণাদাত্রীরূপে আমাদের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক এবং সত্যনিষ্ঠ বক্তব্যের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে আছে।

স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অপূর্ব ঘটনা। ১৯০৫ সালে বড়লাট কার্জন কলমের খোঁচায় বঙ্গপ্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ফলে তার বিরুদ্ধে বাঙ্গালি জাতির মধ্যে যে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় ক্রমে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কার্জন বঙ্গপ্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন বলেই যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, না হলে হতো না— এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই, ইতিহাসও সেরকম সাক্ষ্য দেয় না। দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালি জাতি স্বাধীনতার তপস্যায় হোমাগ্নির যে সমিধ সঞ্চয় করেছিল, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তাই সেদিন পূর্ণচ্ছটায় জ্বলে উঠেছিল। বহুকালের জাতীয় অপমান ও নির্যাতনের ফলে জাতির মনে যে রুদ্ধ আবেগ সঞ্চিত হচ্ছিল, বঙ্গভঙ্গের আঘাতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মতো তাই প্রচণ্ড বেগে বাইরে এসে দেশব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে স্বামী বিবেকানন্দ দেশপ্রেমের মন্ত্রে জাতিকে নবজীবনের পথে চালিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে আনন্দমঠের স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বামীজী তাকে সর্বক্ষেত্রে মূর্ত করে তুলবার জন্য সাধনা করেছিলেন। তাঁর সে সাধনায় যে হোমানল তিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন, তারই সঞ্জীবনী শক্তি পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনে অশেষ প্রেরণা দিয়েছিল।

ওই সময়েই (১৯০১) বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা নবপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ পূর্ণোদ্যমে তাঁর 'আত্মশক্তি'-র মূলমন্ত্র প্রচার করতে থাকেন। ভারতের অতীত গৌরব, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা এই 'বঙ্গদর্শন'-এর মাধ্যমেই প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে তিনি প্রকাশ করতে লাগলেন। আর সেই সময়ে অবধারিত ভাবেই বঙ্গের ভাব ও চিন্তা জগতের নেতৃত্ব প্রধানত রবীন্দ্রনাথই গ্রহণ করেছিলেন।

ওই স্বদেশীযুগের উষালগ্নেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও কাহিনী'-র প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি রচনা করেন। প্রাচীন ভারত এবং আধুনিককালের মারাঠি, রাজপুত ও শিখ ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতি মন্থন করে এই সব কবিতা রচিত হয়েছিল। বঙ্গের তরুণদের হৃদয়ে স্বদেশের শৌর্যবীর্য ও গৌরব-কাহিনি জাগ্রত করাই ছিল ওইসব কবিতার উদ্দেশ্য।

১৯০৪ সালে ২২ জুলাই কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' নামে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওই বক্তব্যে তখনকার শিক্ষিত সমাজ ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। এই 'স্বদেশী সমাজ'-এই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতিগঠনের নিজস্ব পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। বিলেতের আদর্শে রাজনীতি চর্চার পরিবর্তে বিদেশি শাসন-নিরপেক্ষ স্বদেশী স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এবং অতি চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ ওই প্রবন্ধে জনগণের কাছে প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সভ্যতা, ইতিহাস ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে দেশ ও জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র ভিতর থেকে গড়ে তুলতে হবে, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। আত্মশক্তির সাধনা ও বিকাশ এবং অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা অর্জন— এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ওই সুদীর্ঘ বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং হাজার হাজার কপি প্রচারিত হয়েছিল।

এই রকম স্বদেশ প্রেমের উদ্বেলিত প্রেক্ষাপটে ১৯০৪ সালেই আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা কলকাতার 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠান। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নব জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে এই শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই উৎসবে যোগ দিতে পুনে থেকে কলকাতায় আসেন। এই শিবাজী উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী মা ভবানীর পূজা। ছত্রপতি শিবাজী মুঘলের দাসত্বমুক্ত যে স্বাধীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য এই শিবাজী উৎসবের পরিকল্পনা হয়েছিল।

বহু বছরের বিভিন্ন আগ্রাসী বিদেশি ইসলামি শাসনের পরাধীনতা ও আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে হিন্দুজাতি তথা ভারতবর্ষকে আবার স্বাধীনতার আলো দেখাতে এবং আত্মশক্তির পুনঃস্থাপনে উদ্বোধিত করতে যে বীর আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হিন্দুকুল-গৌরব ছত্রপতি শিবাজী (জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৬৩০; মৃত্যু : ৬ এপ্রিল, ১৬৮০)। হাজার বছর ধরে ক্রমাগত ইসলামি শাসকদের নানাবিধ অত্যাচার ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে যে দেশ খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, সেই অবক্ষয়ী প্রেক্ষপটে শিবাজীর ভাবনা 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'— সারাদেশে তথা হিন্দু মানসে এক নবচেতনা সঞ্চারিত করেছিল। শিবাজীর প্রখর বুদ্ধি, বিপুল পরাক্রম ও দুর্মর প্রতিজ্ঞা 'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' সমগ্র সুপ্ত জাতিকে উদ্বেলিত করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল স্বজাত্যভিমানে। তাই তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনটিকে (জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী, ৬ জুন, ১৬৭৪) জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের দিন হিসেবে, বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও আত্মশক্তির পুনরুত্থানের দিন হিসেবে পালন করার জন্য লোকমান্য তিলক সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন, পালিত হলো 'শিবাজী উৎসব'।

বলাবাহুল্য, জাতীয় জীবনে যে নতুন শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল, স্বাধীনতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষা জাতির হৃদয়ে প্রেরণা জোগাচ্ছিল, 'শিবাজী উৎসব' তারই বহিঃপ্রকাশ। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক সেই সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব' পাঠ করে জাতীয় জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। শিবাজীর আদর্শই যে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীকে গ্রহণ করতে হবে, এই কবিতায় স্পষ্টভাবেই কবি তা ব্যক্ত করেছেন।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যে নেতৃত্ব ও আদর্শের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তারই মূর্তরূপ তিনি যেন ছত্রপতি শিবাজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে একটি ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন, যিনি ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হবেন, যাঁকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করব, সেবা করব, তাঁর সঙ্গে যোগ সাধনেই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা হবে। তিনি বলেছেন, একটি ব্যক্তিকে আশ্রয় করে আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে, নাহলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না। প্রবন্ধে ব্যক্ত এই উপলব্ধিই যেন কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ছত্রপতি শিবাজীর মধ্যে। তাই 'শিবাজী উৎসব' কবিতার ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়ে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি—

'মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমূরতি—

সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজোতি
কভু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি হে রাজন,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।

সেদিন শুনিনি কথা আজ মোরা তোমার আদেশ
শিরপাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল।
'একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।'

পুনের প্রত্যন্ত পার্বত্য প্রদেশের মাওয়ালিদের সমর কৌশলে শিক্ষা দিয়ে তাদের উন্নত যোদ্ধায় পরিণত করেন শিবাজী এবং ছোটো ছোটো সেনাদল তৈরি করে বিপক্ষের বড়ো সেনাদলকে আক্রমণ করার কৌশলে বিজাপুর সুলতান কিংবা মুঘল বাদশার সৈন্যদলকে বারবার পর্যুদস্ত করেন তিনি। অসংখ্য গেরিলা যুদ্ধে সফলতার ফসল হিসেবে বহু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গম ও অজেয় গিরিদুর্গ শিবাজী দখল করেন এবং ক্রমে দক্ষিণ ভারতে একটি স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রায়গড় দুর্গে তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনটি হিন্দু সমাজের কাছে একটি শুভদিন। কারণ তা পরাধীন মুঘল ভারতবর্ষে হিন্দু জনমানসে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিল, মুসলমান শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষের আপামর হিন্দুর মুক্তির দিন ঘোষিত হয়েছিল। ফিরে এসেছিল স্বাভিমান— তাই সেই দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব' রূপে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধির ও শক্তির খেলায় হিন্দুপদ পাদশাহী ছত্রপতি শিবাজীর কাছে মুঘল বাদশা আওরঙ্গজেব বারবার পর্যুদস্ত হয়েছেন। ছত্রপতি শিবাজীর জীবন ও কর্ম পদ্ধতি, তাঁর ব্যক্তি নির্মাণের আদর্শ তাঁকে কুশলী রাষ্ট্রনেতার মর্যাদা দিয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছত্রপতি শিবাজীর শৌর্য ও পরাক্রম, দেশ-ধর্ম রক্ষার জন্য নিরলস সংগ্রাম এবং উচ্চত্যাগের আদর্শে আধারিত তাঁর রাজ্য শাসন যে-কোনো কারণেই হোক পূর্ব ভারতে সেইভাবে উপযুক্ত খ্যাতি বা সমাদর পায়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতার মাধ্যমেই রাজা শিবাজীর সেই খ্যাতি বা সমাদর না পাওয়ার কথা অকপটে স্বীকার করে স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, সম্মান এবং তাঁর সুমহান আদর্শের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন তিনশো বছর পার হয়ে গেলেও—

'মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে—
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।'
তাই তিনি শিবাজীকে উদ্দেশ্য করে বলতে পারেন—
'তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার'।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের সেই আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি যাকে অবলম্বন করে সমগ্র সমাজ তথা ভারতবাসী ক্রমে ঐক্যবদ্ধ হবে, আসবে নতুন প্রভাত, তাকে যেন কবি অকস্মাৎ খুঁজে পান সেই মারাঠা বীর তপস্বী ছত্রপতি শিবাজীর মধ্যে। তাই অনুভবী কবি বলেন—

'একথা ভাবেনি কেহ এ তিন শতাব্দ কাল ধরি—
জানেনি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি
দিবে বিনা রণে,
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন বাণী-রূপে আনি দিবে নূতন পরাণ
নূতন প্রভাত।'

দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে আত্মনিবেদিত শিবাজীর শৌর্য, বিক্রম এবং তাঁর ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশ্বকবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সমগ্র বাঙ্গালিকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান যা আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক—

'মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, একসঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসঙ্গে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।'

তথ্যসূত্র :

১. জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ—শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।

২. আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন—শ্রী প্রমোদারঞ্জন ঘোষ, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩।

৩. হিন্দু-সাম্রাজ্য দিবস : বর্তমান প্রেক্ষাপটে—ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য্য, সঙ্ঘ সমাচার, ২৩বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কলকাতা—৬।

৪. রবীন্দ্র রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড।

(লেখক চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক)

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনে সমর্থ স্বামী রামদাসের প্রভাব



দীপক খাঁ

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ-পতাকা কেমনভাবে বৈরাগীর রঙে রঞ্জিত হলো তাঁর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের ‘প্রতিনিধি’ কবিতায়। অ্যাকওয়ার্থ সাহেবের লেখা মারাঠি কাহিনির সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ এই অসাধারণ ইতিহাস-ভিত্তিক কবিতাটি রচনা করেন। ১৮৯৭ সালে কবিতাটি রচিত, যখন মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসবের সূচনা হয়। শিবাজীর হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ, তাঁর স্বাজাত্যবোধ, স্বরাজ্য ভাবনা এবং হিন্দুরাজ্যের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন— যাঁরা তাঁর হৃদয়ে প্রোথিত করিয়েছিলেন প্রথমেই আসে তাঁর মা জীজাবাঈয়ের কথা, তারপর সে যুগের দুই সাধক— সাধু তুকারাম ও সমর্থ স্বামী রামদাস। তুকারামের গান খুব প্রিয় ছিল শিবাজীর। ‘লতার মতো ছড়িয়ে আছো সবার মাঝে তুমি। ফুল দিয়েছ, ফল দিয়েছ আকাশ থেকে ভূমি’— মিষ্টি সুরে সুন্দর গলায় গান গাইছেন মা জীজাবাঈ আর শিশু শিবা সুরে সুর মিলিয়ে বলছে, জয় রামকৃষ্ণ হরি। সেই তুকারামের ভজন মারাঠারা খুব ভক্তির সঙ্গে গাইতেন। জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের প্রভাবে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিদ্বেষ অনেকখানি দূরীভূত হয় মহারাষ্ট্রে।

তখন ভক্তি আন্দোলন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল মহারাষ্ট্রে, তার ফলে মারাঠাদের মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ চেতনার সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিকরা যদিও শিবাজীর সঙ্গে স্বামী রামদাসের কবে সাক্ষাৎ হয়েছিল যে সম্পর্কে যেমন একমত নন, কিন্তু তাঁরা সবাই স্বীকার করেছেন স্বামী রামদাসকে গুরু হিসেবে শিবাজী মেনে নিয়েছিলেন। গোদাবরী তীরে জাম্বর গ্রামে ১৬০৮ সালে রামদাস ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তা তাঁর রচনা পাঠ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। রামদাসের আগে যে সাধুসন্তরা মহারাষ্ট্রে আবির্ভূত হন তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্র ভাবনার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু নাসিকে থাকার সময় স্বামী রামদাস উত্তরের নিজাম শাহি ও মুঘল অত্যাচারের দৃশ্য দেখেছেন। ইসলামি শাসকের শাসনকালে হিন্দুমেয়েরা ছিল বড়ো অসহায়। তাদের উপর অত্যাচার রামদাস দেখেছেন। ইসলামি শাসাকরা একের পর এক হিন্দু মন্দির ভেঙেছে, নতুন মন্দির গড়তে বাধা দিয়েছে। হিন্দু ধর্মের উপর এই অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ উঠে আসেন সমর্থ স্বামী রামদাস।

নাসিক শহরে গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে সাধনা করার পর দীক্ষান্তে ‘রামদাস’ হলেন। তিনি নিজেকে হনুমানের মতো শ্রীরামের সেবক বলে মনে করতেন। মহারাষ্ট্রে তিনি মারুতির (হনুমান) অবতার বলে পূজিত। মুসলমানদের ধর্মান্তরণের চাপ থাকায় তিনি চলে এলেন সহ্যাদ্রির পাহাড়ি অঞ্চলে। এখানে স্বামী

রামদাস গড়ে তুললেন রামদাসী সম্প্রদায়। এঁরা শ্রীরামের উপাসক। শ্রীরামের মতোই তাঁরা রাক্ষস বধে পিছপা নন। তিনি পূর্ববর্তী ভক্তিমার্গের সাধুদের কোনো বিরুদ্ধাচরণ করেননি, কিন্তু তিনি যে ধর্মপথের নির্দেশ দিলেন সেখানে ভক্তির সঙ্গে শক্তিকেও স্তুতি করতে হবে বলে প্রচার করলেন। শ্রীরামের মন্দির নির্মাণ করলেন আর যেখানেই সম্ভব সেখানেই হনুমানের মন্দির। রামদাসী সাধুরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন আর আর হিন্দুদের ক্ষাত্রতেজে উজ্জীবিত করতেন। তিনি ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করবার নির্দেশ দিলেন। ধর্মকে ব্যক্তির থেকে প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিধর্মীদের আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য হিন্দুধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস এক নবজাগরণের উন্মাদনা নিয়ে এল। শিবাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার আগেই স্বামী রামদাসের এই হিন্দুজাগরণের আহ্বান অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত হিন্দুজাতির মধ্যে প্রতিবাদী মানসিকতার বীজ বুনে দিয়েছিল। তাঁর আহ্বান : 'মরাঠা তিতুকা মেলবাবা— মহারাষ্ট্র ধর্ম বাড়বাবা' অর্থাৎ 'প্রত্যেক মারাঠা একত্রিত হও এবং মহারাষ্ট্র-ধর্ম রক্ষার জন্য সংগ্রাম কর।'

স্বামী রামদাসের পরিষ্কার কথা— 'যারা হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করে তাদের কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিতে হবে'। রাষ্ট্রভাবনায় ভরপুর স্বামী রামদাস শিবাজীর মধ্যে তাঁর স্বপ্নের নায়ককে দেখেন। আফজল খাঁ হত্যা যেন তাঁর স্বপ্নপূরণ। দেশের ধর্মরক্ষা যেন স্বাধীনতার প্রতীক। আর এই ধর্মরক্ষা করতে হলে যদি প্রাণ যায়, ক্ষতি কী! হাজার হাজার হিন্দু মারাঠি শিবাজীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা প্রাণ দেবেন তবু ধর্ম দেবেন না। শিবাজীর রণধ্বনি হলো— হর হর মহাদেব। বিধর্মীদের সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধই ধর্মরক্ষার যুদ্ধ। সমসাময়িক বহু সাধুসন্তের চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে গুরু স্বামী রামদাস প্রত্যক্ষ ভাবে শিবাজীকে প্রভাবিত করেন। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম ও ধর্মরক্ষার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগিয়ে তোলেন গুরু রামদাস। মাঝে মাঝে যখন শিবাজীর মধ্যে চরম বৈরাগ্য দেখা দিত তখন যেন শ্রীকৃষ্ণের মতো গুরু রামদাস শিবাজীকে উজ্জীবিত করতেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করেন তেমনি গুরু রামদাস শিবাজীকে শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষাত্রধর্ম পালনে অনুপ্রাণিত করেন।

শিবাজী তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্য গুরু রামদাসের পায়ে সমর্পণ করে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ধর্মরক্ষার জন্য রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধ করতেন। তিনি গুরু রামদাসের কাছে আবেদন করেন, তাঁকে রক্ষার দায়িত্ব গুরু রামদাসকেই গ্রহণ করতে হবে, কারণ তিনি যা করছেন তার কোনো কিছুই নিজের জন্য নয়, গুরুর প্রতিনিধি হয়ে গুরুর ঈপ্সিত কাজই তিনি করে চলেছেন।

শিবাজী যখন স্বাধীন হিন্দুস্বরাজ্য গঠন করলেন তখন যেন গুরু রামদাসের সারা জীবনের সাধনা সফল হলো। শিবাজীও তাঁর রাজ্যাভিষেকের পর, রাজ্যাভিষেকের সময় যত রত্নালংকার পেয়েছিলেন সব গুরু রামদাসের চরণে অর্পণ করেন।

অনেকেই মনে করেন যখন ঔরঙ্গজেব দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা ভারতবর্ষে ইসলাম বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর, তখন তার পালটা বিরোধী শক্তি হিসেবে সারা ভারতবর্ষে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য হিন্দুদের শক্তিকে শিবাজী শুধু সংহত করেননি তার নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও শিবাজী মহারাজ ধর্মের নামে গোঁড়ামি করেননি। বৈষ্ণব ধর্মের ভাবচেতনার মধ্যে যে সমন্বয়ী, বিভেদহীন, সর্বস্বাগত ভক্তিমার্গ পরিলক্ষিত হয় যেই ভক্তিমার্গের প্রতিও শিবাজী মহারাজের শ্রদ্ধা ছিল। শত প্ররোচনাতেও ইসলামের মর্যাদাহানি হতে দেননি। যুদ্ধ জয় করে বা কোনো দুর্গ দখল করে কোরান পেলে শিবাজীর সৈনিকরা সেই কোরানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শিবাজীর হাতে তুলে দিত। শিবাজী মহারাজ সেই কোরান তাঁর কোনো মুসলমান মৌলবির হাতে তুলে দিতেন। নিজ ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার অর্থ যে অন্য ধর্মের প্রতি অবমাননা নয়— তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ শিবাজী মহারাজ।

মহারাষ্ট্রবাসী হিন্দুদের মধ্যে জাতপাত ও বর্ণবিদ্বেষ অপেক্ষাকৃত ভাবে কম। এর প্রধান কারণ তুকারাম, একনাথ এবং স্বামী রামদাস প্রমুখ ধর্মগুরুর প্রভাব। সমাজপতিদের আধিপত্য অত্যাচারে পরিণত হয় নি, শূদ্র ও অন্ত্যজদের উপর অন্যায় পীড়ন শিবাজী মহারাজ রুখে দিয়েছিলেন। শিবাজী মহারাজের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু স্বরাজ্য গড়ে তোলার পথে অন্তরায় সৃষ্টিতে হিন্দুরা সেদিন কম দায়ী ছিল না। □

With Best Compliments from-

A

Well Wisher



পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালির হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বিশে জুন

প্রণব দত্ত মজুমদার

১৯৪৭ সালের ২০ জুন, স্বাধীন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়েছিল, বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড হিসেবে। এতদিন যে সব রাজনৈতিক দল পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় থেকেছে তারা সুচতুরভাবে এই সত্যটিকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছ থেকে আড়াল করে গেছে। দেশ ভাগের সময় মুসলিম লিগের নেতা জিন্নার করাল গ্রাস থেকে অবিভক্ত বঙ্গের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা একপ্রকার ছিনিয়ে এনে স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, হিন্দু বাঙ্গালিদের মানসম্ভ্রম, ধর্ম নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য। নবীন প্রজন্মকে এই ইতিহাস জানানো দরকার।

১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ লাহোর অধিবেশনে দ্বিজাতিত্ত্বতের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাব পাশ করেছিল। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের এই আলাদা দেশের দাবিকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে সমর্থন করেছিল।

১৯৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সমস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়েছিল; ১৯৪২-এর ৮ আগস্ট কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ করেছিল কিন্তু ইংরেজ সরকার তা কঠোর হস্তে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেস নেতাদের সব জেলে ভরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হলে এবং বিজয়ী ইংরেজ নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সেনানীদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে দিল্লির লাল কেল্লায় এনে বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে, এই বিচারের অভিঘাতে সারা দেশে উত্তাল আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। ইংরেজের নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও স্থল বাহিনীর ভারতীয় সেনারা ইংরেজ সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছিল। ইংরেজ কর্তারা উপলব্ধি করল যাদের মাধ্যমে এই দেশকে এতদিন নিয়ন্ত্রণ করা হতো তাদেরই আনুগত্য যখন শেষ হয়ে গেছে তখন এবার তাদের যাওয়ার দিন এসে গেছে। তাই বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও মানসম্মান নিয়ে ভারত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইংরেজ সরকার।

১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ 'ক্যাবিনেট মিশন' ভারতে আসে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে। মুসলিম লিগ নেতা জিন্না মুসলমানদের জন্য দাবি করলেন পাকিস্তান। কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের দাবির পক্ষে দাঁড়িয়ে গেল।

এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালে দেশের প্রাদেশিক সভাগুলোর নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনে সারা ভারতের নিরিখে মুসলিম লিগ খুব একটা ভালো ফল করেনি কিন্তু বঙ্গে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সেখানে সুরাবর্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগের সরকার গঠিত হয়। ধুরন্ধর জিন্না উপলব্ধি করলেন যে রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করে পাকিস্তানের দাবি পূরণ করা সম্ভব নয়; তাই তিনি দাবি পূরণে ইসলামি উপায়টি প্রয়োগ করবেন ঠিক করলেন। তা হলো 'জিহাদ'। দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'। মুসলিম লিগ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কংগ্রেস যদি আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশের দাবি মেনে না নেয়

তবে ১৬ আগস্ট (পবিত্র রমজান মাসের শুক্রবার) থেকে শুরু হবে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'। অবশেষে ১৫ আগস্ট এসে গেল, অথচ কংগ্রেসের তরফে কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হলো না। মুসলিম লিগের সরকার আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল বঙ্গের বুকেই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' নামক জিহাদের বিভীষিকা নামিয়ে আনা হবে।

১৬ আগস্ট শুক্রবার বঙ্গজুড়ে হরতালের ডাক দেয় মুসলিম লিগ। এখন যেখানে শহিদ মিনার সেখানে মুসলিম লিগ নমাজের পরে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। সমবেত মুসলমান জনতার সামনে অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি, মন্ত্রী নিজামুদ্দিন, কলকাতার মেয়র এস এন ওসমান প্রমুখ গরম গরম বক্তৃতা করে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'কে সাফল্য মণ্ডিত করার আহ্বান জানান। মিটিং শেষ হওয়ার পর শতশত মুসলমান গুন্ডা যারা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই মিটিঙে এসেছিল তারা পূর্ব পরিকল্পনা মতো কলকাতা জুড়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙ্গা, হত্যা, নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন ইত্যাদি আরম্ভ করে দিল। প্রায় তিন দিন ধরে কলকাতা জুড়ে চলেছিল এই নারকীয় অত্যাচার যা ইতিহাসে 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামে পরিচিত। প্রায় ৫ হাজার লোকের প্রাণ গিয়েছিল, ১৫ হাজার লোক আহত হয়েছিলেন, বহু নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছিল এই হিন্দ নরসংহার কাণ্ডে।

এতসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও গান্ধীজী বা নেহরুর মধ্যে কোনো হেলদোল নেই। মুসলিম লিগ যখন দেখল কংগ্রেস তাদের দাবির ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছে না তখন তারা আবারও জিহাদ করলো। এবার মুসলিম লিগ অ্যাকশন করল পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে। দিনটি ছিল ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। ঘরে ঘরে যখন লক্ষ্মীপূজার আয়োজন চলছিল তখন জিহাদিরা হিন্দুদের উপর নরপশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই চিরাচরিত ইসলামিক জিহাদের কায়দা। গ্রামের পর গ্রাম লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙ্গা, হিন্দু পুরুষদের হত্যা, হিন্দু নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ, কুমারী মেয়েদের জোর করে মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, বিবাহিত নারীদের শাঁখা পলা ভেঙে দেওয়া সিঁদুর মুছে দেওয়া ইত্যাদি। আর হয়েছিল ব্যাপক হারে ধর্মান্তরণ। হিন্দুদের জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছে। রাজি না হলে জুটেছে প্রচণ্ড মার আর তাতেও কাজ না হলে হত্যা করা হয়েছে। প্রায় দু সপ্তাহ ধরে এই নারকীয় পৈশাচিক অত্যাচার চলেছে। ইতিহাসে এই ঘটনা 'নোয়াখালি গণহত্যা' নামে পরিচিত হয়ে আছে।

জিহাদিদের এই ভয়াবহ রূপ দেখে কংগ্রেস নেতারা নিজেদের অক্ষমতা বুঝতে পারলেন। মুসলমানদের জন্য আলাদা পাকিস্তানের দাবি কংগ্রেস মেনে নিল। বলা যায় বাঙ্গালি হিন্দুর রক্তের বিনিময়ে ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, গান্ধীজীও তাই মেনে নিলেন।

অবিভক্ত বঙ্গে তখন যেহেতু মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেখানে সুরাবর্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগের সরকার চলছে তাই জিন্না পুরো বঙ্গপ্রদেশকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানালেন। গান্ধীজী বা নেহরু বঙ্গকে ভারতের মধ্যে রাখার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না।

পুরো বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন একমাত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কন্সটিটুয়েন্সি থেকে বঙ্গের প্রাদেশিক সভায় নির্বাচিত সদস্য । উক্ত দুটি অ্যাকশনের সময় তিনি হিন্দুদের সাহায্যের জন্য আপ্রাণ কাজ করেছেন। তিনি তাঁর ছোটো দলের সীমিত ক্ষমতা নিয়েই হিন্দুদের পাশে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দুদের ওপর ওই দুটি আক্রমণের প্রেক্ষিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পুরো বঙ্গ যদি পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হয় তবে অবিভক্ত বঙ্গে যে প্রায়৪৫ শতাশ হিন্দু বসবাস করছে তারা ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় কিছুতেই সুরক্ষিত থাকবে না। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করলেন বঙ্গকে বিভক্ত করে হিন্দু অধ্যুষিত একালাগুলো আলাদা করে বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনুরূপ ভাবে শিখ ও হিন্দু অধ্যুষিত পঞ্জাবের অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটা না করা হলে ভারতভাগ করা যাবে না। তিনি তাঁর এই দাবি নিয়ে জনমত গঠনের জন্য দলমত নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দু নেতাদের কাছে গেলেন; তিনি গান্ধাজী-সহ কংগ্রেস নেতাদের কাছেও গেলেন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার তিনি সারা বঙ্গজুড়ে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুললেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ মার্চ কলকাতায় এক সম্মেলনের আহ্বান করেন তিনি। এই সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালি ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন, যেমন— ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মাখনলাল চৌধুরী প্রমুখ। ওই সম্মেলনে বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য আলাদা হোমল্যান্ডের দাবিতে প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই দাবির পক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন— ড. মেঘনাথ সাহা, ড. যদুনাথ সরকার, বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, লর্ড সিনহা, মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং কংগ্রেস নেতা ঈশ্বরদাস জালান প্রমুখ। ৪৬-এর হিন্দুদের ওপর আক্রমণে মুসলমানদের ভয়াবহ রূপ দেখে কংগ্রেসের অনেক ছোটো বড়ো নেতাদেরও বোধোদয় হয়েছিল এবং হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শামাপ্রসাদের এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। বঙ্গ জুড়ে ৭৬টি জনসভা করে বঙ্গকে উত্তাল করে তুলেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ।

কলকাতা-সহ পুরো বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন জিন্না। কলকাতা বন্দর এবং তাকে কেন্দ্র করে এত শিল্প ও কলকারখানা হাতছাড়া হয়ে গেলে আর কী থাকবে? তাই বঙ্গকে ঘুরিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অন্য আর একটি চালও চেলেছিলেন জিন্না। তিনি তাঁর অনুগত কয়েকজন বিশ্বস্ত মুসলমান নেতা এবং তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দিকে একটি কৌশল প্রয়োগের কাজে লাগালেন। ওই পরিকল্পনা মাফিক সুরাবর্দি বঙ্গের কংগ্রেসের যে গ্রুপটি 'খাদি কংগ্রেস' বলে পরিচিত যাঁদের নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ, তাঁদের কাছে প্রস্তাব দিলেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বঙ্গ ভাষাভাষী মানুষের জন্য একটি আলাদা সার্বভৌম দেশ (An Independent Undivided Sovereign Bengal in divided India) গঠনের দাবি করা হোক। মুসলিম লিগের অভিসন্ধি ছিল কোনোরকমে টোপ দিয়ে পুরো বঙ্গকে একবার আলাদা একটি দেশ বানাতে পারলে তারপর উপযুক্ত সময়ে সংখ্যালঘু

হিন্দুদের উপর জিহাদ করে ওটিকে ইসলামিক দেশ বানানো কঠিন হবে না।

মাত্র কয়েক মাস আগেই কলকাতা ও নোয়াখালির বুকে মুসলমান জিহাদিদের ভয়াবহ আক্রমণ হয়ে গেল, যার রক্তের দাগ তখনো মোছেনি, সেই সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ক্ষমতার লালসায় জর্জরিত, নির্লজ্জ আমাদের নেতারা সেই টোপটি কিন্তু গিলেছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ 'খাদি কংগ্রেস' এর নেতারা সুরাবর্দির পরামর্শে মহা উৎসাহে 'অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ' গঠনের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এতে ইন্ধন জোগালেন তৎকালীন বঙ্গের গভর্নর ফ্রেডরিক ব্যারোজ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং তফশিলি ফেডারেশনের নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। এদের এইসব কাজকর্ম দেখে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। তিনি ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল তারকেশ্বরে 'Bengal Partition Convention'-এর আয়োজন করেন। ওই কনভেশনে তিনি জোরালো কণ্ঠে বলেন— বঙ্গ ভাগ করা ছাড়া বাঙ্গালি হিন্দুদের বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। বঙ্গ ভাগ বাঙ্গালি হিন্দুদের জীবন মরণের প্রশ্ন। বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড আমরা চাই, এ আমাদের পেতেই হবে এবং তা এখনই নয়তো আর কখনোই তা পাওয়া হবে না।

শরৎচন্দ্র বসু মুসলিম লিগ নেতা আবুল হাসিমের সঙ্গে মিলে অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গের সংবিধানের একটি ড্রাফ্‌টও তৈরি করে ফেলেন। সেই ড্রাফটে ছিল— 'অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গে'র Constituent Assembly-তে ৩০ জন সদস্য থাকবেন, ১৬ জন মুসলমান ১৪ জন হিন্দু। অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গের মন্ত্রীসভায় সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান মন্ত্রী থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী সবসময়ই হবেন একজন মুসলমান, হোম মিনিস্টার হবেন একজন হিন্দু। চাকরিতে হিন্দু মুসলমান সমান অধিকার পাবে ইত্যাদি। অখণ্ড বঙ্গের সংবিধানের ড্রাফট নিয়ে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সুরাবর্দি, কিরণশঙ্কর রায় বঙ্গের গভর্নর ফ্রেডরিক ব্যারোজকে সঙ্গে নিয়ে ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটোনের সঙ্গে দেখা করে অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাব রাখেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ চুপ করে বসে থাকলেন না। তিনি ১৯৪৭ সালের ২৩ এপ্রিল ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেনর সঙ্গে এক গোপন বৈঠক করেন এবং তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝান কেন বঙ্গ এবং পঞ্জাবকে ভাগ করা দরকার মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দু ও শিখদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।

ড. শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৭ সালের ১১ মে নেহরু এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে 'সুরাবর্দি-বসু-হাসিম'-এর 'অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ' গঠনের পরিকল্পনার কথা জানান এবং এর বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আপত্তির কথাও জানিয়ে তিনি লেখেন— অখণ্ড বঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের হাতে বাঙ্গালি হিন্দুদের নিরাপত্তা কিছুতেই থাকবে না। বিগত নরসংহারগুলিই তার প্রমাণ। বাঙ্গালি হিন্দুদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করবার জন্য বঙ্গকে ভাগ করে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে ভারতভুক্ত করতে হবে। সর্দার প্যাটেল বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে শরৎচন্দ্র বসুকে কড়া ভাষায় লিখলেন— শ্রী বসু সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে তো সরিয়ে নিয়েছেনই এমনকী প্রদেশের রাজনীতিটাও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে করছেন না। দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে এরকম কাজ সমর্থনযোগ্য নয়। এর পরেও সর্দার প্যাটেলের চিঠির জবাব দিয়ে শরৎচন্দ্র বসু তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সর্দার প্যাটেল তাঁর বক্তব্যকে আর কোনো গুরুত্ব দিলেন না। অখণ্ড বঙ্গ গঠনের প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়ল। এভাবেই জিন্না ও সুরাবর্দি অখণ্ড বঙ্গকে ঘুরপথে কবজা করার যে ফন্দি করেছিলেন তা বানচাল করে দিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ।

১৯৪৬ সালের হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ভয়াবহ ঘটনাকে সামনে রেখে বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ডের দাবিতে যে তীব্র জনমত ড. শ্যামাপ্রসাদ গড়ে তুলেছিলেন, বঙ্গের আপামর হিন্দু জনতা এবং বঙ্গের প্রায় সব বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা এমনকী ছোটোবড়ো অনেক কংগ্রেস নেতাও যেভাবে ড. শ্যামাপ্রসাদের আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন তাকে উপেক্ষা করতে পারেননি সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারা এবং ব্রিটিশ সরকার। ৪৬ সালের নরসংহারের পরে জিন্নাও বেশ কিছুটা চাপের মধ্যে ছিলেন। এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ২ জুন, মাউন্ট ব্যাটন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি মিটিং করলেন। সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন— কংগ্রেসের পক্ষে আচার্য কৃপালনী (তখন কংগ্রেসের সভাপতি), পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মুসলিম লিগের পক্ষে— মহম্মদ আলি জিন্না (তখন মুসলিম লিগের সভাপতি), লিয়াকত আলি খান, আব্দুর রব নিস্তার এবং শিখদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সর্দার বলদেব সিংহ। ওই মিটিঙে মাউন্টব্যাটন তাঁর প্ল্যান (যার সরকারি নাম— HM Government's Statement 3 june 1947) ব্যাখ্যা করলেন। আলোচনার পর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক উপস্থিত নেতারা বঙ্গ ও পঞ্জাবকে ভাগ করে ভারত বিভাজনের প্রস্তাব মেনে নিলেন; কিন্তু জিন্না জিদ ধরলেন গোটা বঙ্গপ্রদেশ ও পঞ্জাব-সহ পূর্ণাঙ্গ পাকিস্তান তার চাই। গান্ধীজী এসে ভাইসরয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে গেছিলেন। আবার ৩ জুন সকাল ১০ টায় ওই নেতাদের মিটিঙে ডাকলেন মাউন্ট ব্যাটন। এবার তিনি জিন্নাকে তাঁর প্রস্তাব মানতে বাধ্য করলেন, তিনি জিন্নাকে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন জিন্না যদি তাঁর এই প্রস্তাব মেনে না নেন তবে তিনি 'পাকিস্তান'কে চিরকালের মতো হারাবেন। অবশেষে চাপে পড়ে জিন্না ভাইসরয়ের কথা মেনে নিলেন।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন বিকেল ৩-৩০-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনট অ্যাটলি 'হাউস অব কমনস'-এ ঘোষণা করে দিলেন ভারতবর্ষকে বিভাজিত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং তার সঙ্গে বঙ্গ ও পঞ্জাবের লেজেসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যদি পাশ করে তবে বঙ্গ ও পঞ্জাবকে ভাগ করা হবে। সেই ঘোষণা মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গের অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটি হয় এবং বেশিরভাগ সদস্য বঙ্গভাগের পক্ষে রায় দেন। একই ভাবে পঞ্জাবের অ্যামেম্বলিতেও ভোটাভুটির মাধ্যমে পঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এই ভাবে ড. শ্যামাপ্রসাদের তীব্র আন্দোলনের ফলে বঙ্গের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে ভারতভুক্ত করে তৈরি হয়েছিল বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ'। সুতরাং ১৯৪৭ সালের ২০ জুনকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন বলতেই পারি।

ড. শ্যামাপ্রসাদের অনমনীয় তীব্র আন্দোলনের জন্য বাঙ্গালি হিন্দুরা মানসম্ভ্রম নিয়ে বাঁচার জন্য বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদকে বাঙ্গালি হিন্দুরা যোগ্য সম্মান এখনও দেয়নি।

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ও চিত্রশিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার সম্মান



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সোনার চামচ মুখে নিয়ে না জন্মালেও মিলেছে তার বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতি। দিল্লি থেকে লাভ করেছে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি। হাওড়া জেলার লিলুয়া ঝিল রোডের বাসিন্দা সৃজিতা কোলে সালকিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্পগ্রাম স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। ছোট্ট সৃজিতার ডাকনাম ঐশিতা। গত মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে সৃজিতাকে আইকনিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এইটুকু বয়সেই সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে সৃজিতার। মাত্র ১০ বছর বসে চিত্রশিল্পী হিসেবে তার কাজের এই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি তার এই ছোট্ট জীবনের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট।

ছোট্ট, একরত্তি সৃজিতাকে অনায়াসেই 'শিশু প্রতিভা' অভিধায় অভিহিত করা যায়। খুব ছোটোবেলা থেকেই আঁকা-আঁকির দিকে প্রবল ভালোবাসা, আকর্ষণ ও ঝোঁক সৃজিতার। বাধা না দিয়ে বাবা-মা জুগিয়ে গিয়েছেন উৎসাহ, প্রেরণা ও সমর্থন। সৃজিতার অভিভাবকদের সাধ থাকলেও সাধ্য বা সামর্থ্য ছিল না নামি-দামি কোনো আর্ট স্কুলে সৃজিতাকে ভর্তি করার। বাবা সুরজিৎ কোলে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। মা মৌসুমী কোলে গৃহবধূ। বাবার কাছেই অঙ্কনের হাতেখড়ি সৃজিতার। এরপর নিজের চেষ্টাতেই অনেকটা এগিয়েছে সৃজিতা। এখন রিষড়ার মডার্ন ড্রইং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত চক্রবর্তীর কাছে আঁকা শিখছে সৃজিতা। জলরং, পেন্সিল স্কেচ, তৈলচিত্র তথা অঙ্কন শিল্পের সমস্ত মাধ্যমেই সমান পারদর্শী সৃজিতা। চিত্রশিল্পের সব মাধ্যমেই তার সমান দক্ষতা। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে ছবি আঁকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সৃজিতা। তার প্রাপ্ত পুরস্কারের বহর সৃষ্টি করেছে চমক। এইটুকু বয়সে তার পাওয়া এত পুরস্কার তৈরি করেছে নজিরও। আজ সৃজিতার ঘরভর্তি ট্রফি, মেডেল। বই ও স্মারক ঠাসা তাদের ঘর। এইটুকু বয়সে তার পাওয়া মানপত্রগুলিকে একগুচ্ছ করে জুড়লে মোটা একটা বই হয়ে যাবে। তার প্রতিভার দৌলতে যেকোনো প্রতিযোগিতাতেই কোনো না কোনো পুরস্কার তার বাঁধা। কলকাতায় বসে জাতীয় সম্মান লাভের পাশাপাশি ২০২২ সালের মে মাসে জাপানের টোকিয়ো থেকে তার ক্রিয়েটিভ আর্টে আঁকা যামিনী রায়ের ছবি আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মান লাভ করেছে। এছাড়াও জাতীয় স্তরে দুর্দান্ত ছবি আঁকার পুরস্কারস্বরূপ সৃজিতা অর্জন করে রুপোর সরস্বতীমূর্তি ও পেন।

ইতিমধ্যেই সৃজিতার ঝুলিতে এসেছে জাতীয় স্তরের ইন্ডিয়া বুকস্ অফ রেকর্ডস্ ও ইন্ডিয়া রেকর্ডস্ পুরস্কার। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কয়েকটি বই প্রকাশনা সংস্থা তাদের প্রকাশিত বেশ কিছু বইতে সৃজিতার আঁকা প্রচ্ছদ ব্যবহার করেছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি অরুণ চক্রবর্তী, সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য, ইতিহাসবিদ গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ীকে সৃজিতা তার আঁকা ছবি উপহার দিয়েছে। তাঁরা সকলেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন এই শিশু চিত্রশিল্পীকে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৃজিতা চিত্রশিল্পী হওয়ার পাশাপাশি একজন বাচিকশিল্পীও। অ্যাবাকাস পরীক্ষায় সৃজিতা পাঁচ বার ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে সৃজিতার স্বপ্ন একটি আর্ট স্কুল স্থাপন এবং একটি আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা। কম বয়সে এতরকম সাফল্য লাভ করে একজন বিশিষ্ট শিশু চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠা সৃজিতা এই প্রজন্মের তার বয়সি সব শিশুদের কাছে আদর্শ স্বরূপা। সৃজিতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন সার্থক হলে তা হবে সৃজনশীলতার আদর্শে দীক্ষিত, সৃষ্টিশীলতার পথের পথিকদের সামনে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণার উৎস। □

সেয়ানে সেয়ানে

এক শেয়াল ও এক সারসের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। একদিন শেয়াল সারসকে বলল, ভাই সারস, আগামীকাল আমার বাড়ি তোমার নেমতন্ন। তুমি অবশ্যই আসবে। সারস খুশি মনেই বন্ধু শেয়ালের বাড়ি যেতে রাজি হলো।

সারসের ঠোঁট তো সরু ও লম্বা। সে ওই থালা থেকে কিছুই খেতে পারল না। বেচারার যেমন খিদে পেয়েছিল তেমনই রয়ে গেল।

সারস খেতে পারছে না দেখে শেয়াল তো বেশ মজা পেল। সে কপট রাগ দেখিয়ে বলল, কী বন্ধু, তুমি





পরদিন সময় মতো সারস শেয়ালের বাড়ি এল। নেমতন্ন বলে কথা! সে বাড়ি থেকে কিছু খেয়ে আসেনি। গল্প করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। খিদেও পেয়েছে। এমন সময় শেয়াল তাকে ডাকল—বন্ধু এসো, এবার একসঙ্গে খাওয়া যাক। সারস তার সঙ্গে খেতে বসল।

এদিকে নেহাত ঠাট্টা করবার জন্য শেয়াল সারসের জন্য অন্য কিছু ব্যবস্থা না করে একটা থালায় বেশ কিছুটা ঝোল ঢেলে খেতে দিল। নিজেও ওইরকম একটা থালায় ঝোল ঢেলে খেতে শুরু করল।

শেয়াল তো দিব্যি থালা থেকে চেটেপুটে ঝোল খেতে লাগল। কিন্তু ভালো করে খেলে না যে! আমি কিন্তু দুঃখ পেলাম। খাবারের স্বাদ ভালো হয়নি বুঝি?

সারস বুঝতে পারল তাকে ঠকানোর জন্যই শেয়াল এরকম করেছে। সে মোটেই না বুঝে একাজ করেনি। তাই শেয়ালের কথার কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু যাবার সময় শেয়ালকে পরের দিন নিজের বাড়িতে নেমতন্ন করল।

পরের দিন শেয়াল ঠিক দুপুরে সারসের বাড়ি পৌঁছে গেল। বলল, হ্যাঁ ভাই সারস, খাবার তৈরি তো? সারস বলল, হ্যাঁ ভাই, সব তৈরি। খেতে বসলেই হয়।

সারস পরিবেশনের জন্য ভেতরে গেল। একটু পরেই সেখান থেকে বলল, এসো ভাই, আমরা খাবার খেয়ে নিই। শেয়াল ভেতরে গিয়ে দেখে সারস সরু গলাবিশিষ্ট দুটো কুজোর মধ্যে খাবার পরিবেশন করেছে।

সারস তো তার লম্বা সরু ঠোঁট দিয়ে কুজো থেকে খাবার তুলে অনায়াসে খেতে লাগল। কিন্তু বেচারা শেয়াল প্রচণ্ড খিদে থাকলে কী হবে, সে কোনোমতেই কুজোর ভেতরে মুখ ঢোকাতে পারল না। কুজোর গায়ে গড়িয়ে পড়া ঝোল কেবল চাটতে থাকল। আর বলতে থাকল, খুব ভালো খেলাম, খুব ভালো খেলাম।

খাওয়ার পর্ব শেষ করে শেয়াল ভাবতে লাগল, সারসের তো কোনো দোষ নেই, সে আমার কাজের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে, অপরকে জব্দ করতে চাইলে নিজেকেও জব্দ হতে হয়। একথা ভাবতে ভাবতে শেয়াল তার বাড়ির দিকে রওনা হলো।

সংগৃহীত

নদ-নদী পরিচয়

বিদ্যাধরী নদী



বিদ্যাধরী নদী নদীয়া জেলার হরিণঘাটার কাছে উৎপত্তি হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত , দেগঙ্গা ও হাবরা এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই নদী প্রাচীনকালে বঙ্গীয় সভ্যতার প্রধান নদীপথ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই নদীর তীরেই চন্দ্রকেতুগড় বন্দর গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এই নদীটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতা শহরের অন্যতম জলনিকাশি পথ। প্রায় তিনশো বছর আগে এই নদী গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ফলে নোনাজলে পরিপূর্ণ।

এসো সংস্কৃত শিখি-২৭

দেবী - (দেবী)। **দেব্যা:**-(দেবীর)
দেব্যা: নাম সরস্বতী - **দেবীর নাম সরস্বতী**
দেব্যা: নাম কালী। দেব্যা: নাম উমা।
যুবতী - যুবত্যা: **(যুবতী-যুবতীর)**
অভ্যাস করি –
যুবত্যা: নাম কামিনী। বান্ধব্যা: নাম সঙ্গীতা।
নদ্যা: নাম গঙ্গা। জনন্যা: নাম মালতী।
সখা নাম বৈশাখী। ভগিন্যা নাম কেতকী।
প্রয়োগ করি–
পত্নী, পুত্রী, তরুণী, নর্তকী, বান্ধবী,রমণী,কুমারী, নারী, স্ত্রী, দ্রোণী,
লেখনী, তটিনী, তরঙ্গিণী।
বিঃ দ্রঃ – ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গে শদের সঙ্গে ঢ্যাঃ /যা: হবে।

ভালো কথা

বন্ধুত্ব

আমাদের বাড়ির উঠোনে পাশাপাশি দুটো নারকেল গাছ আছে। বহুদিন থেকেই দুটো চিল একটা নারকেল গাছে বাসা বেঁধে থাকে। ওদের ছানা হয়। ছানা বড়ো হয়ে উড়ে চলে যায়। গত বছর থেকে একটা নারকেল গাছে দুটো বুলবুলি এই সময় বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে। পরে ডিম ফুটে ছানা হয়। এবারও বুলবুলি বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছে। বাবা বলল, ছোটো ছোটো পাখিরা চিলের মতো শিকারি পাখিদের বাসার কাছে বাসা বাঁধে। তাহলে কাক ওদের ডিম বা ছানা চুরি করে খেয়ে ফেলতে পারে না। আমি এবার ভালো করে লক্ষ্য করলাম, বুলবুলির বাসার কাছে কোনো কাক এলেই একটা চিল তাড়া করে তাড়িয়ে দেয়। আবার যখন চিল দুটো বাসায় থাকে না, তখন কোনো কাকা চিলের বাসার কাছে এলেই বুলবুলি জোরে শিস দিতে থাকে। তখনই চিল দুটো ছুটে ওদের বাসায় ফিরে আসে। কাক পালিয়ে যায়।

শ্রাবণী মহান্তি, নবম শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) চ্চ শি ত ক্ষি	(১) তা গ্য বি ভা ধা
(২) ষ চ্চা ভি লা	(২) মা ভা ত র তা

৩ জুন সংখ্যার উত্তর
(১) অনুশাসন (২) বিচারপতি

৩ জুন সংখ্যার উত্তর
(১) অধিকারহণ (২) অনাহারজর্জর

উত্তরদাতার নাম
(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কল-৮৪। (৩) শ্রেয়া সরদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা। (৪) শিবাণী বর্মন, গাজোল, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher



সুনীলের ছেড়ে যাওয়া ব্যাটন নিয়ে ছুটবেন কে?

নিলয় সামন্ত

সদ্য শেষ হয়েছে প্র্যাক্টিস। ২০০২ সালের কথা। মোহনবাগান ক্লাবের ভিতরের ঐতিহাসিক গোলটেবিলে চিকেন স্টুয়ে টোস্ট ডুবিয়ে ফুটবলারদের জমাটি আড্ডা চলছে। দাপুটে কোচ সুব্রত ভট্টাচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাও কি খুব নিশ্চিন্তে ছিলেন? ভাবতে পেরেছিলেন, পরের দুই দশকে তাঁর পায়েই লেখা থাকবে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ? বেশ মনে আছে, শুরুর প্র্যাক্টিসেই মন জয় করে নিয়েছিলেন সুনীল। আপাত কঠিন গাম্ভীর্য বজায় রেখেও সুব্রত সেদিন বলেছিলেন, 'ছেলেটার পায়ে খেলা আছে। দারুণ ছটফটে। শ্যাম থাপার মতো বাইসাইকেল কিকে গোলও করে দিল!' এইটুকু বাচ্চা ছেলে মোহনবাগানে খেলবে! সেদিনই শুনেছিলাম, ছেলেটার নাম সুনীল ছেত্রী। ৬ জুন সকালে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে সাদা টি-শার্টের সুনীল যখন নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করছিলেন, তখন মনে হলো, প্রায় ২২ বছরের দীর্ঘ ফুটবল কেরিয়ারে কত কত উত্থান-পতন। দেশের হয়ে ১৫০ ম্যাচে ৯৪ গোল। নানা ক্লাবের হয়ে আরও অনেক। সবচেয়ে বড়ো কথা, ভাইচুং ভুটিয়া পরবর্তী যুগে বা তিনি থাকার সময়েই তো ভারতীয় ফুটবলের মুখ হয়ে উঠেছিলেন সুনীল ছেত্রী। এরপরে কে? সত্যি বলতে, সেরকম কোনও নাম খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না ! না হলে কি আর ফিফা সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসি-রোনাল্ডোর সঙ্গে একই পোডিয়ামে সুনীলের ছবি দিয়ে সকালেই পোস্ট করে, 'এক লেজেন্ডের অবসর।'

ক্যাপ্টেনের আর্মব্যান্ডটা সুনীলের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন ভাইচুং। বলছিলেন, ভারতীয় ফুটবল বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল। সেই আর্মব্যান্ডকে কীভাবে যত্ন করে সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন সুনীল। আইএম বিজয়নের যখন কেরিয়ারের শেষ দিক, তখন চলে এসেছিলেন ভাইচুং ভুটিয়া। তিনি থাকতে থাকতেই গোটা দেশ জেনে গিয়েছিল, সুনীল ছেত্রী ছুটবেন ভারতীয় ফুটবলের ব্যাটন হাতে। কিন্তু এখন? সুনীলের ছেড়ে যাওয়া ব্যাটন নিয়ে ছুটবেন কে? একটা সময় জেজে-কে বলা বতো সুনীলের ভবিষ্যৎ। তিনি আজ হারিয়ে গিয়েছেন কোথায়! আর এখন? মনবীর সিংহ ছাংতে, বিপিন সিংহ, বিক্রম প্রতাপ? খুব কষ্ট করেও যে কোনও নামকেই সুনীলের ধারে-কাছে আনা যাচ্ছে না।

সুনীলের জীবনের দিকে ফিরে তাকালে এই শব্দগুলো হয়তো একটু অদলবদল করে নিতে হবে। কারণ অধিনায়ক হওয়ার আগেই দলের নেতা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সুনীলের মধ্যে সহজাত একজন নেতা যে লুকিয়ে রয়েছে তা বোঝা গিয়েছিল অনেক আগেই। ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের অনেকেরই মনে থাকবে ২০০৮ সালের এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে ভারত-মায়ানমার সেমিফাইনাল ম্যাচের কথা। বৃষ্টিভেজা কাদা মাঠে ফুটবল খেলার পরিবেশই ছিল না। সেই ম্যাচে শেষ দিকে ছেত্রীর একটি গোল ভারতকে ফাইনালে তুলে দেয়। সেই গোলটির কথা অনেকেরই মনে আছে। ভাইচুং ভুটিয়ার ক্রস সুনীল। নিজেই গোল করে সমতা ফিরিয়েছিলেন। টাইব্রেকারে ক্যামেরুনকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিল ভারত। এই দু'টি এবং অনেক ছোটো ছোটো ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছিল সুনীলের প্রতিভা। তত দিনে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, গোল করার জন্য আর কেউ না থাকুক, তিনি অন্তত আছেন। সতীর্থদের চাঙ্গা করতেন তিনি। সতীর্থদের তাতাতেন তিনি। অধিনায়কের আর্মব্যান্ড ছাড়াও দলের মধ্যে এভাবে নেতৃত্ব দেওয়া যায়, এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সুনীল। নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, দলের দরকারে তিনি আছেন।

তরুণদের উদ্দেশে নিঃশব্দে বলতেন, আমাকে দেখে শেখো। তখন ভাইচুংয়ের



শেষের সময় চলে এসেছিল। ভারতীয় দলের পরবর্তী নেতা বেছে নিতে তাই কাউকেই খুব একটা মাথা খাটাতে হয়নি। ভারতীয় দলের হয়ে খেলা প্রথম থেকে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত সুনীলের দায়বদ্ধতা ছিল একই রকম। বয়সের কারণে ধার কমেছে, গতি শ্লথ হয়েছে। কিন্তু যেটা কমেনি, সেটা হলো জেতার অদম্য খিদে এবং ইতিবাচক মানসিকতা। জিতলে যেমন অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে ভেসে যাননি। তেমনই হেরে গিয়ে কখনও সুনীল কাঁদেননি। মাথা নীচু করে থেকেছেন, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সংকল্প নিয়েছেন পরের বার সুযোগ এলে একই ভুল দ্বিতীয় বার না করার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০২৪-এ সেই যাত্রার শেষ পর্বে এসেও সুনীল সেই একই রকম।

সুনীলের কেরিয়ারের শুরুর দিকে জাতীয় দলের জার্সিতে নিজেকে যতটা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন, ক্লাবের হয়ে ততটা পারেননি। ২০০৮ সালে জেসিটি ছাড়ার পর থেকে সুনীলের ফর্ম একটু হলেও খারাপের দিকে গিয়েছিল। জাতীয় দলের হয়ে যে রকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বা কঠিন কঠিন জায়গা থেকে গোল করছিলেন, সেই কাজ ক্লাবের জার্সিতে করতে পারছিলেন না।

এখানেই সুনীলের জীবনে একটি বড়ো পরিবর্তন এনে দেয় পর্তুগালের স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়ায় তাঁর সফর। কিছু দিন আগে সাংবাদিকদের সামনে স্বীকার করেছিলেন, বয়সটা আরও একটু কম হলে পর্তুগাল থেকে ফিরতেন না। কিন্তু স্পোর্টিঙের সঙ্গে কাটানো সময়, সেখানকার আধুনিক অনুশীলন প্রত্যক্ষ করা, কোচেদের থেকে পাওয়া শিক্ষা পরবর্তীকালে সমসাময়িকদের থেকে বহু গুণ এগিয়ে দিয়েছিল তাঁকে।

পর্তুগালে গিয়ে সুনীলের আরও একটি বড়ো প্রাপ্তি হলো, ফিটনেসের গুরুত্ব বুঝতে শেখা। বিরাট কোহলি এক সময় বলেছিলেন, ২০১১ বিশ্বকাপের পর নিজের চেহারা আয়নায় দেখার পর ফিটনেস সম্পর্কে ধারণা বদলে গিয়েছিল তাঁর। সুনীলের ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা অনুঘটকের কাজ করেছিল জানা নেই। কিন্তু ফিটনেসকে তিনি যা গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এখনও দেন, তার কোনও তুলনা নেই। নিজের ডায়েট, ঘুম এবং অনুশীলন নিয়ে কোনওরকম আপসের রাস্তায় হাঁটেননি। কোনওদিন ছুঁয়ে দেখেননি মদ। এখনকার ফুটবলারদের অনেকেই এই সংযম দেখাতে পারেন না। সুনীল সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। এখানেও তিনি বার্তা দিয়েছেন, আমাকে দেখে শেখো। আদর্শ অধিনায়কদের ঠিক যে রকম বার্তা দেওয়া দরকার, সেটাই করেছিলেন।

অধিনায়ক হিসেবে কোনও দিন সতীর্থদের ঘাড়ে কোনও কিছু চাপিয়ে দেননি। সবার আগে বলতেন, খেলাটাকে ভালোবাসো। দলটাকে ভালোবাসো। ওখানেই আসল আনন্দ লুকিয়ে। ম্যাচে হার-জিত নিয়ে পরেও ভাবা যাবে। দল গোল খেলে সবার আগে ছুটে গিয়েছেন গোলকিপারের কাছে। পিঠ চাপড়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন। বাকিদের কাছে টেনে কোথায় ভুল হলো তা শুধরে দিয়েছেন। আদর্শ টিমম্যান। আদর্শ অধিনায়ক।

ভারতীয় ফুটবলের হতাশাজনক পারফরম্যান্স দেখে যাঁরা মুখ ফিরিয়েছিলেন, সুনীল তাঁদের মাঠে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। অবসরের দিনে যুবভারতীতে ৬২ হাজার দর্শকের উপস্থিতি সেটা আবার প্রমাণ করে দিয়েছে। ভারতের ফুটবল ম্যাচ দেখতে আবার লোকে মাঠে আসছে। যার এক এবং একমাত্র কারণ ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এর পর কী পড়ে রয়েছে তা হয়তো জানা নেই। তবে এতদিন ধরে তাঁরা গর্ব করে বলতে পেরেছেন, 'তোমাদের কাছে মেসি, রোনাল্ডো আছে তো কী হয়েছে? আমাদের কাছেও একটা সুনীল ছেত্রী আছে।' ভারতে আবার কবে সুনীল ছেত্রী তৈরি হবে উত্তরটা সুনীলেরও জানা নেই ভারতীয় সমর্থকদেরও। □

সঙ্ঘপূজা করলে যে পূজা সম্পন্ন হয়

রামব্রহ্ম দেবশর্মা

বর্তমান হিন্দুসমাজে সঙ্ঘ জীবনের প্রাসঙ্গিকতা কতটা প্রয়োজনীয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতন অর্থাৎ এক একজন হিন্দুর ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়ার যোগফল আড়ে-বহরে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের পতনকে কতটা বাড়িয়ে দিচ্ছে সে ধারণা আমাদের নেই। একদিকে এক ভয়ংকর শক্তি হিন্দুসমাজকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন ও একাকী করে দিচ্ছে, পাশাপাশি সেই ভয়ংকর শক্তিই নিজেরা এককাট্টা হয়েছে সমাজে, রাজনৈতিক জীবনে এমনকী অর্থনৈতিক প্রয়াসেও। তারা এবং তাদের দোসররা হিন্দুদের ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক করে দিচ্ছে, এই বোধ ও বিচার বোধহয় সঙ্ঘশক্তির মাধ্যমেই বিচার ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এখনও অধিকাংশেই ঘুমিয়ে আছে হিন্দুসমাজ। অতএব অনতিবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দই হবে তার প্রদীপ্ত প্রকাশন, 'অন্যতম সংস্করণ'। নন্দলাল ভট্টাচার্য রচিত সুখপাঠ্য গ্রন্থ 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'-র নান্দীমুখ সমেত সমগ্র বইটি পড়ে এবং সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়।



আচার্যদেবের জন্মশতবর্ষে বইটির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল, এটি তার দ্বিতীয় সংস্করণ। উপন্যাসের আদলে এখানে তুলে ধরা হয়েছে স্বামীজীর জীবনী, কর্ম এবং কৃতিত্ব। গ্রন্থের পুরোভাগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজীর কথনে ব্যক্ত হয়েছে, গ্রন্থটি যুগাচার্য ও তাঁর নির্মিত প্রতিষ্ঠান প্রস্ফুটনের এক চুলচেরা বিশ্লেষণ। বইটিতে ৮৩টি বিন্দুতে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে, মনে হবে যেন এক একটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা।

৮১ সংখ্যক বিন্দুতে ব্যাখ্যাত হয়েছে স্বামী প্রণবানন্দজী কেন হিন্দু মিলন মন্দির গড়লেন, যে মন্দির রক্ষা করবে হিন্দুকে, যে সংগঠন রক্ষা করবে ভারতকে, যে মন্দির হয়ে উঠবে মহামিলন ক্ষেত্র। গ্রন্থটি থেকে উজ্জ্বল উদ্ধার করা হলো, ''এবার ডাকলেন তিনি (স্বামী প্রণবানন্দ) মুসলমানদের। তাদের তিনি বললেন, 'দেখ তোমরা যে অন্যায় করেছ হিন্দুরা তার প্রতিকার করবে। তোমরা তার জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছ?' মুসলমান হলেও এরা প্রণবানন্দজীকে নিজের লোক বলেই মনে করত। তাই কোনো কিছু গোপন না করেই তারা বলে, 'হ্যাঁ আমরা সব কিছু জানি। তার জন্য তৈরিও হচ্ছি।' 'কী রকম?' 'গ্রামে গ্রামে সভা করে সব মুসলমান ভাইকে জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকতে বলছি। চাঁদাও তুলছি।' 'কত চাঁদা তুলেছ তোমরা?' '৭০০ টাকা, দরকারে আরও পাব।' এবার প্রণবানন্দজী বললেন, 'আমি কিন্তু হিন্দুদের জন্য লক্ষ টাকা খরচ করব।' 'মহারাজ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের ভয় দেখাবার জন্য একথা বলছেন, নিশ্চিতভাবেই আপনি আমাদের কোনো ক্ষতি করবেন না।' এবার প্রণবানন্দ বলেন, 'দেখ, আমি হিন্দু মুসলমান বুঝি না। অন্যায় যে করবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। এবার তোমরাই বলতো, দোষী কারা? কারা অন্যায় করেছে, হিন্দু না মুসলমান?' প্রথমে একটু আমতা আমতা করলেও তারা স্বীকার করল যে, দোষ মুসলমানদেরই। 'তাই যদি হয়, তাহলে অন্যায়ের পথ নিয়েছ কেন? তোমরা সরে দাঁড়াও, অপরাধীরা শাস্তি পাক।' এবার তারা বিনীতভাবেই বলল, 'না মহারাজ, তা হয় না। যত অপরাধীই হোক, ওরা আমাদের জাত ভাই। তাদের ত্যাগ করব কেমন করে? সেটা যে ধর্ম বিরোধী কাজ হবে!' আচার্য প্রণবানন্দ বুঝলেন সব। উভয়পক্ষকে ডেকে তখনকার মতো একটা মীমাংসাও করে দিলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন হিন্দু মুসলমানের মানসিকতার প্রভেদ কোথায়? সেইদিনই তিনি ঠিক করেন, হিন্দু জাতি গঠনের কাজ আর ফেলে রাখা যায় না।''

বইটির পরবর্তী সংস্করণের জন্য দুটি প্রস্তাব কেবল দেওয়া যেতে পারে।

১. পরিশেষে একটি বর্ণানুক্রমিক অনুসন্ধান সূত্র চাই। তাতে চট করে যে কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সহজে খুঁজে পাবেন কোনো কোনো পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে মিলন মন্দির, হিন্দু রক্ষীদল, সঙ্ঘবাণী, সঙ্ঘচারণ দল, শ্যামাপ্রসাদ-প্রণবানন্দ সম্পর্ক, হিটলার সম্পর্কে প্রণবানন্দের মন্তব্য, কুম্ভমেলা, বাজিতপুর, গয়া লীলাপার্ষদ প্রসঙ্গ যেমন স্বামী মুক্তানন্দ, স্বামী ত্রিদিবানন্দ, স্বামী বেদানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ সমেত নানান বিষয়।

২. গ্রন্থটির ভূমিকায় অন্তত উল্লেখ থাকা দরকার প্রস্তুত গ্রন্থটি রচনার জন্য আকরগ্রন্থ/প্রবন্ধ-নিবন্ধ/তথ্য কী কী ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বইটির ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতাই বাড়ে। বইটির পড়বার পর যুগাচার্য সম্পর্কে নতুন পাঠকের উত্তরপাঠের খোঁজখবর নেওয়া তাতে সম্ভব হবে।

গ্রন্থের নাম : শৃণ্বন্তু বিশ্বে। লেখক : নন্দলাল ভট্টাচার্য। প্রকাশক : ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। মূল্য : অনন্ত ভক্তি।



লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আশানুরূপ ফল না হওয়ার কিছু কারণ

অমলেশ মিশ্র

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির ফল আশানুরূপ হয়নি। ২০১৯ সালে জয়ী হয়েছিল ১৮ আসনে। এবারে ওই ১৮টির ৮টিতে বিজেপি পরাজিত। কাঁথি ও তমলুক বিগত নির্বাচনে ছিল তৃণমূলের। এবারে হয়েছে বিজেপির মোট জয় ১২ আসনে।

বিজেপিতে স্লোগান ছিল— চোর ধর জেল ভরো। পিসিকে প্রাক্তন করব। ভাইপোকে জেলে ঢোকাব। স্লোগানগুলি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কার্যকরী করার লোক ছিল না। বলতে চাইছি— নেতা ছিলেন অনেক, সংগঠক, যোদ্ধা কর্মী ছিলেন কম। শুধু হাওয়াতে নৌকো এগোয় না। পাল তোলার মাঝি চাই। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সংগঠন তৈরি আমরা যারা করেছিলাম, তারা এখন বিজেপিতে কার্যকরী ব্যক্তি হিসেবে গ্রাহ্য নন। সে যুগে পয়সা ছিল না, লোক ছিল না। সিপিএম ছিল দুর্ভেদ্য। তবু অনেক জেলাতেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেশ কিছু আসনে বিজেপি জয়ী হতো কেবল মাত্র সাংগঠনিক দক্ষতায়। এবং এই দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত পার্টি ক্লাস হতো।

এবারে যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, তাঁরা এই দিকগুলিতে নজর দেননি—

১. পুরানো দক্ষ পার্টি কর্মীদের সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন।

২. লক্ষ্মী ভাণ্ডারের প্রভাব কী হতে পারে এবং তা কীভাবে ব্যর্থ করা যায়— তার কোনো কৌশলের কথা ভাবা হয়নি।

৩. রাজ্যে ৪২টি লোকসভায় ৪৩ হাজার ক্লাবকে বছরে একবার অন্তত দুর্গাপূজার জন্য ৬০-৭০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। ওই ক্লাবগুলি নির্বাচনে কী প্রভাব ফেলতে পারে তা ভাবা হয়নি।

৪. পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা হয়নি।

৫. যে ইস্যুগুলি তুলে নির্বাচনে লড়াই করা হচ্ছিল--- সেগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু বুথ ভিত্তিক কর্মী সংস্থান ও তাদের জন্য নির্বাচনী ক্লাস নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল তাহলে মানুষের মনে তারা ছোটো ছোটো সভা করে প্রভাব ফেলতে পারতেন। অন্তত এটা বোঝানো যেত যে— অনুদান উন্নয়ন নয়। এর জন্য রাজ্য সরকার ছয় লক্ষ কোটি টাকা ঋণ করেছে। প্রত্যেক রাজ্যবাসীর মাথায় কত হাজার করের ঋণের বোঝা পড়েছে।

৬. অঞ্চলভিত্তিক নির্বাচনী কর্মী সভার খুব প্রয়োজন ছিল— জেলার নেতারাই তা করতে পারতেন। রাজ্য নেতারা বড়ো বড়ো জনসভার অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন— কিন্তু জেলা নেতাদের নিয়ে নির্বাচন ভিত্তিক সভা করলে ভালো হতো।

৭. আমার মনে হয় ওড়িশার থেকে আমাদের কিছু শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

৮. শুভেন্দু অধিকারী সংগঠনের বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ এক নেতা। তিনি আমার উল্লিখিত ২ এবং ৩ নম্বর বিষয়ে কিছু করতে পারতেন। কিন্তু তিনি জনসভা ও আদালতের লড়াইতে তাঁর যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও এদিকে নজর দেননি।

৯. দলের লোকসভা প্রার্থীরাও সম্ভবত কর্মীদের দক্ষ করে তোলার বিষয়ে মনোযোগ দেননি।

মোদীর তৃতীয়বারের জন্য ঐতিহাসিক শপথ

অবসান 'ইন্ডি' জোটের ক্ষমতার স্বপ্ন দেখা

অবশেষে গত ৯ জুন সন্ধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য শপথ নিল এনডিএ-মন্ত্রীসভা। ওহ, একটু ভুল বোধহয় বলে ফেললাম। বলা উচিত ছিল, অন্তত সোশ্যাল মিডিয়ার মতে, শপথ নিল মোদী মন্ত্রীসভা। কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় আমাদের দেশের রীতি সরকারের যিনি প্রধান, তাঁর নামে সেই সরকার পরিচিতি লাভ করে। ইউপিএ সরকারের আমলে তা মনমোহন সিংহ সরকার নামেই পরিচিত ছিল, যদিও মনমোহন সিংহ না ছিলেন তদনীন্তন কংগ্রেসের সভাপতি, না কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। কিন্তু সেই সরকারকে মনমোহন সরকার নামে অভিহিত করতে কারোরই কোনো সমস্যা হয়নি।

কেন এই প্রসঙ্গ এল? কারণ ৪ জুন নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে এমন একটি হাওয়া তোলার চেষ্টা হচ্ছে যে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএর বকলমে বিজেপির নির্বাচনী ভরাডুবি ঘটেছে। বিরোধীরা তো এমনও দাবি তুলেছেন যে, এই ভরাডুবির নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে মোদী-অমিত শাহের পদত্যাগ করা উচিত। নির্বাচনী পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখবো বিজেপি একাই ২৪০টি আসন পেয়েছে, যা দেশের প্রধান বিরোধী জোটের প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যার থেকে ঢের বেশি। এককভাবে দেশের প্রধান বিরোধী দলের থেকে প্রায় আড়াইগুণ আসন বেশি পেয়েছে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের বিজেপি। এরপরও নৈতিকতার দোহাই দিয়ে যাঁরা নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর বলার কী থাকতে পারে।

আসলে এই পরিস্থিতিটা উদ্ভবের পেছনে মোদী-অমিত শাহই দায়ী। যদি প্রথমবার মোদী ক্ষমতায় আসার সময়ে এই ফল হতো অর্থাৎ বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেত, যা তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী বেশ মানানসই ছিল, তাহলে হয়তো এতো কথা উঠতো না। কিন্তু যেহেতু প্রথম দু'বার বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল, তৃতীয়বারে তার ব্যতিক্রম হতেই গেল গেল রব তুলে দিয়েছে বিরোধীরা।

একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসনের বিপরীতে ভারতের শাসন ক্ষমতায় জোট রাজনীতির গুরুত্ব প্রথম তুলে ধরেছিলেন বিজেপিরই অটলবিহারী বাজপেয়ী, ১৯৯৮ সালে দেশে প্রথমবার তেরো দলের সরকার গঠন করে। এতগুলো দলের সরকার গড়েও যে সরকারের স্থিতিশীলতা পূর্ণ মেয়াদের জন্য রাখা যায়, তা তিনিই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয় এনডিএ সরকার গঠন করে।

একথা ঠিক ভারতীয় রাজনীতিতে এখন কায়েমি স্বার্থের জন্য বহু আঞ্চলিক দলের উত্থান হয়েছে, যারা সুযোগ পেলে ভারত সরকারকে বিপাকে ফেলতে চাইবে। কিন্তু সরকারের একক বৃহত্তম দলের আসন সংখ্যা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেশ কাছে থাকে, তবে স্বার্থান্বেষী আঞ্চলিক দলের দাপট যে বেশ কমে যেতে বাধ্য তা সহজবোধ্য। এনডিএ-র দু'একটি শরিক সাম্প্রতিক অতীতে পালটিবাজির রাজনীতি করলেও তাতে তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হয়নি। সেই অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে একই ভুল বারবার করবেন, এ আশঙ্কা অমূলক বিশেষ করে তাঁরা যখন পরিণত রাজনীতিবিদ। অপরপক্ষে দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক জোটে বিচিত্র স্বার্থের অনুসন্ধানী মূলত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের ভিড়, সর্বভারতীয় দল হিসেবে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা একশোও ছুঁতে পারেনি, তাই কংগ্রেসের নেতৃত্বকে মানতে প্রস্তুতও নয় একাধিক শরিক দল, যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস, শরদ পাওয়ারের এনসিপি প্রভৃতি দল রয়েছে। তাই স্থায়িত্বের প্রশ্নে মোদী-অমিত শাহের এনডিএ বিরোধী জোটের চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি এগিয়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ বা কারা যদি দাবি করে বসেন, এনডিএ সরকার মাত্র কিছু দিনের জন্য, এরপর ক্ষমতায় আসবে 'ইন্ডি' জোট, তবে মুজতবা আলির ভাষায় বলতেই হয় 'আস্তে কন কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো'।

আরও একটা বিষয়, ভারতের জনগণ বিগত দুটি নির্বাচনে কংগ্রেসের পরিবারতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন, তাই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে নির্বাচন লড়ে কংগ্রেস বিরোধী দলের মর্যাদাও লাভ করতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়েই মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সভাপতি করে কংগ্রেস ও বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে। এখন আবার ঘুরপথে রাহুলকে বিরোধী দলনেতা করতে চাইলে দেশবাসী সেটা সুনজরে দেখবেন না। সকলের মনে আছে নিশ্চয়ই, ২০০৪ সালে শরিকি অসন্তোষে মনমোহন সিংহকে প্রধানমন্ত্রী করতে বাধ্য হলেও তাঁকে অকেজো করে নিজে ডিফ্যাক্টো প্রধানমন্ত্রী সেজে দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন সোনিয়াও তার ফলও হাতেনাতে পেয়েছিলেন। এরাজ্যের নিরিখে বিজেপির ফল খারাপ বলা যাবে না। একদশক আগেও রাজ্য থেকে লোকসভায় বিজেপি এক ডজন আসন পাচ্ছে, এই ফল অকল্পনীয় ছিল। বাম আমলে কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বিরোধী এতো আসন পাচ্ছে, এমনটা হয়নি।

একথা ঠিক যে, বিজেপির ফল আশানুরূপ হয়নি। কিন্তু তাই বলে বিজেপি আর দেশের শাসনক্ষমতায় থাকবে না কিংবা ২০২৬-এও বিজেপি এরাজ্যে কলকে পাবে না, এ আশা যাঁরা করছেন স্পষ্টই বোঝা যায় স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তাঁদের গ্রাস করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টা সত্ত্বেও এরাজ্যবাসী যে বাম-কংগ্রেসের ওপর বিশেষ আশা করেন না, ভোটের ফলাফলে তা স্পষ্ট। এবারে ৩০টিতে প্রার্থী দিয়ে বামেদের ২৮টিতে জামানত জব্দ, মালদা মুর্শিদাবাদের প্রান্তিক শক্তি কংগ্রেস এবার মুর্শিদাবাদও খুইয়েছে। সুতরাং এরাজ্যের বিরোধী রাজনীতি বিজেপিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে, এরাজ্যের শাসক দল চাক বা নাই চাক।

২০১৯-এ তৎকালীন বিজেপি সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ জয় ব্যতীত বিজেপির সোনালি দিন অধরাই থেকে যাবে। এবার ওড়িশা বিজয় সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কর্মীরা অমিত শাহের ওপর ভরসা করতেই পারেন। □

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বেনজির, মোশাররফ বা রাগীব আলিতে পরিপূর্ণ

শিতাংশু গুহ

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজির আহমদ গোপালগঞ্জে হিন্দুদের শত শত বিঘা জমি দখল করেছেন। সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ফরিদপুরে অরুণ গুহ মজুমদারের ৭০ কোটি টাকা মূল্যের বাড়ি মাত্র ২০ লক্ষ টাকায় কিনেছিলেন। সেটি পরে ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ মিডিয়ায় এ নিয়ে কিছুটা হইচই হয়েছিল বলে। সিলেটের রাগীব আলি হিন্দুর সম্পত্তি জবরদখল করে দানবীর হয়েছেন। তিনি কিছুকাল জেল খেটেছেন, তাতে কী! এখন তার বড়ো ছেলে উকিল। তাই তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে। সাবেক এমপি দবির উদ্দিনের বিরুদ্ধে হিন্দু জমি জবরদখলের বিশদ রিপোর্ট মিডিয়ায় এসেছিল। বাস্তবতা হচ্ছে, সুযোগ পেলে প্রায় সবাই হিন্দু সম্পত্তি দখল করেন বা করছেন।

মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন যখন হিন্দুর বাড়িটি দখল করেন, তখন প্রয়াত আব্দুল গাফফার চৌধুরী আমেরিকায় এসেছিলেন। এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আমি তাঁকে মন্ত্রীর হিন্দু বাড়ি দখলের ঘটনা জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমায় বললেন, 'হিন্দুর সম্পত্তি গনিমতের মাল'। তাই বলছিলাম, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বেনজির, মোশারফ বা রাগীব আলিতে পরিপূর্ণ। এদের মধ্যে কেউ ধরা পড়ে। কেউ কেউ 'ভূমিদস্যু' বলে আখ্যায়িত হন। এই ছোটোখাটো দস্যুরা দেশের সর্বত্র রয়েছে। মিডিয়ায় মাঝেমধ্যে কিছু সংবাদ বেরিয়ে যায়, তখন আমরা জানতে পারি। অন্যরা 'অধরা' থেকে যায়! এমনকী তদানীন্তন পাকিস্তান বা পূর্ব-পাকিস্তান এবং আজকের বাংলাদেশ নামক দেশকেও 'ভূমিদস্যু' বলা যায়।

একটি দেশ কীভাবে ভূমিদস্যু হয়? পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালে জমিদারি স্বত্ব আইন বাতিল হয়। আইনটি ছিল শুধুমাত্র পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্যে নয়। কারণ পশ্চিম-পাকিস্তানে জমিদাররা ছিলেন প্রায় সবাই মুসলমান এবং পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সকল জমিদার ছিলেন হিন্দু। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং হিন্দুদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার জন্যে পাকিস্তান এই আইনটি করেছিল এবং এর সফল বাস্তবায়ন করে। ফলে হিন্দুরা জমি হারায়, মুসলমানরা 'বিনে পয়সায়' হিন্দুর জমি জবরদখল করে। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুর জমি কেড়ে নেওয়ার ইতিহাস এক করুণ অধ্যায় এবং সেই ধারা আজও চলছে।

এরপর ১৯৬৫ সালে আসে শত্রু সম্পত্তি আইন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই আইনটি প্রণীত হয়। প্রথমে এর ব্যবহার বড়ো বড়ো শিল্প-কারখানার ওপর সীমিত ছিল। ১৯৬৯ সালে আন্দোলনের মুখে জরুরি অবস্থা উঠে যায়, কিন্তু শত্রু-সম্পত্তি আইনটি বিশেষ ক্ষমতাবলে রেখে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৭১, স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের দলিলে বলা হয়েছিল যে, দেশ স্বাধীন হলে সকল 'কালাকানুন' বাতিল হবে। তা হয়নি। বঙ্গবন্ধু আইনটি রেখে দিয়েছিলেন 'অর্পিত-সম্পত্তি' নামে। মনোরঞ্জন ধর তখন আইনমন্ত্রী ছিলেন। একজন হিন্দুর হাত দিয়েই এই আইনটি আনা হয়। হয়তো তিনি না আনার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। এই জন্য হিন্দুরা মনোরঞ্জন ধরকে মনে রাখেনি।

তারপর জেনারেল জিয়া, তিনি তহশিলদারদের ক্ষমতা দেন হিন্দুর সম্পত্তিকে 'শত্রু-সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা করার। ফল যা হবার তাই হয়। তহশিলদাররা দলিলে হিন্দুর নাম দেখে দেখে তা 'শত্রু-সম্পত্তি' হিসেবে নোটিশ দেওয়া শুরু করে। হিন্দুরা বাপ-দাদার সম্পত্তি হারাতে শুরু করে। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, একবার সম্পত্তি 'শত্রু-সম্পত্তি' হলে তা থেকে বেরিয়ে আসা একরকম অসম্ভব। 'শত্রু' বা অর্পিত সম্পত্তি, যাই বলি না কেন, এর যাঁতাকলে হিন্দুরা পিষ্ট হতে থাকে। এরশাদ আমলে কিছুটা স্বস্তি নেমে আসে, তিনি একটি 'স্টে-অর্ডার' জারি করেছিলেন। খালেদা জিয়ার আমলে আবার শুরু হয় হিন্দুদের জমি জবরদখল।

শেখ হাসিনা প্রথম দফায় ক্ষমতাসীন হয়ে ৫ বছর সময় নেন আইনটি বাতিল করতে। মেয়াদের একেবারে শেষে ১১ এপ্রিল, ২০০১-এটি বাতিল হয়, যদিও একটু ফাঁক ছিল। আইনটি গেজেট হতে একটি সময়সীমা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে শেখ হাসিনা নির্বাচনে পরাজিত হন। খালেদা জিয়া আবার ক্ষমতাসীন হন এবং আইনের খসড়াটি বাতিল করেন।

২০১৩ সালে শেখ হাসিনা পুনরায় আইনটি বাতিল করেন। আইনটি এখন নেই, কিন্তু এর জ্বালাতন আছে। এর সুফল এখন পর্যন্ত কোনো হিন্দু পেয়েছেন বলে কেউ শোনেনি। এরমধ্যে হিন্দুরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। হারানো সম্পত্তি হিন্দুরা ফেরত পাবেন, এই গ্যারান্টি নেই।

এই আইনে হিন্দুরা কতটা সম্পত্তি হারিয়েছেন সেই হিসাব নেই। বলা হয়, দেশের প্রতিটি উপজেলা অফিসই শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তির ওপর। হ্যাঁ, গাফফার চৌধুরীর সংজ্ঞামতে ওইসব 'গনিমতের মাল' প্রায় সবই মুসলমানদের দখলে। শুনতে খারাপ লাগলেও কথা কিন্তু সত্য। পুলিশ প্রধান, মন্ত্রী, এমপি যখন হিন্দু সম্পত্তি দখল করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই নীচের তলার মানুষ বসে থাকবে না।

হিন্দুর জমি বা সম্পত্তি জবর দখলের ঘটনা বাংলাদেশে একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। গ্রামে-গঞ্জে এটি মহামারী আকার ধারণ করেছে। মামলা-মোকদ্দমা তো আছেই! দেখার কেউ নেই। তাই বলছিলাম, দোষ একা বেনজির আহমদের নয়, বাংলা দেশে ছোটো বড়ো বেনজিরের সংখ্যা অসংখ্য। □

বাংলাদেশের সাংসদকে খুন করে মৃতদেহের ছবি পাঠানো হয় দলের নেতার ফোনে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৩ মে কলকাতার নিউটাউনের ফ্ল্যাটে খুন করা হয় বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনারকে। বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ-৪-এর প্রতিনিধিত্বকারী তিন বারের আওয়ামি লিগের সংসদ সদস্য, ৫৬ বছর বয়সি আনোয়ারুল আজিম গত ১২ মে কলকাতায় পৌঁছেছিলেন এবং দীর্ঘদিনের সহযোগী গোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর কলকাতার সিঁথির বাড়িতে উঠেছিলেন। গোপাল বিশ্বাস জানান যে পরের দিন আজিম মেডিক্যাল চেক-আপের জন্য যাওয়ার কথা জানিয়ে চলে যান। এরপর নিউটাউনের একটি হাউজিং কমপ্লেক্সে দুই পুরুষ ও একজন মহিলা-সহ আনারকে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এমপিকে আর কমপ্লেক্স থেকে বের হতে দেখা যায়নি, কিন্তু তার সঙ্গীদের ১৩-১৫ মে-র মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাদের দুজনকে বড়ো ব্যাগ নিয়ে বের হতে দেখা যায়। গোপাল বিশ্বাস ও আজিমের মেয়ে আজিমের ফোন নম্বর থেকে কথিত ভাবে টেক্সট মেসেজ পান, তাতে কোনো কাজে আজিম দিল্লিতে ছিলেন বলে লেখা ছিল। তবে তারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলে গত ১৮ মে নিখোঁজ ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন গোপাল বিশ্বাস। বিধাননগর ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট, এসটিএফ ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির আধিকারিকদের একটি দল গত ২২ মে সকালে তল্লাশি চালাতে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে পৌঁছেছিল। তারা রক্তের দাগ খুঁজে পেলেও মৃতদেহ ছিল না।

সিআইডি এবং বাংলাদেশের তদন্তকারীদের মতে, আজিম এক্ষেত্রে কোনো ভাবে হানিট্র্যাপের শিকার হয়েছিলেন এবং তারপর কন্ট্র্যাক্ট কিলারদের দ্বারা তাকে খুন করা হয়। খুনের পর তার শরীরের ছাল ছাড়িয়ে হাড়-মাংস আলাদা করা হয়েছিল। তারপর মাংসের টুকরো কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দেওয়া হয়। পরে ট্রলি ব্যাগে ভরে হাড়ের টুকরো বাগজোলা খালে এনে ফেলে দেয় জিহাদ ও সিয়াম নামক দুই ব্যক্তি। জিহাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে লাগাতার তল্লাশি চালালেও কয়েকদিন ধরে কিছুই পাওয়া যায়নি। সাহায্য নেওয়া হয় নৌসেনারও। গত ৮ জুন বনগাঁ সীমান্ত থেকে ধরা পড়ে সিয়াম হোসেন। খুনের পর নেপাল পালিয়ে গিয়েছিল সে। গত ৯ জুন সকালে তাকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালানো হয় আর তাতেই উদ্ধার হয় হাড়। বাংলাদেশের বাসিন্দা সিয়াম ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। মূল চক্রী আখতারুজ্জামানের কাছে কাজ করত সে। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়রের ছোটো ভাই আখতারুজ্জামান ওরফে শাহিন আজিমকে হত্যার জন্য ৪ কোটি বাংলাদেশি টাকা খুনিদের দিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। তার যে রিসর্ট রয়েছে বাংলাদেশে সেগুলো দেখভালের দায়িত্ব ছিল সিয়ামের উপর। মাসিক ৫০ হাজার টাকা বেতন ছিল। সিয়ামই জিহাদকে মুম্বই থেকে কলকাতাতে নিয়ে এসেছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। বাংলাদেশের মিডিয়া রিপোর্টে সেই দেশে একটি গেস্ট হাউস কেনা নিয়ে আজিম ও শাহিনের মধ্যে মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই খুনের সঙ্গে অতিবাম চরমপন্থী সংগঠনের সদস্যদের যোগও পাওয়া গিয়েছে। সিয়াম ও জিহাদ ছাড়াও শাহিনের পরিকল্পনায় আমান, ফয়সাল সাজি ও মোস্তাফিজ নামে কয়েকজন অপরাধীও এই খুনের সঙ্গে যুক্ত বলে খবর।

নিউটাউনের অভিজাত আবাসনে খুন হওয়া বাংলাদেশের এমপি আনোয়ারুল আজিমকে খুন করার পর তার ছবি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শক্তিশালী চেতনানাশক দিয়ে আনোয়ারুল আজিমকে অচেতন করে ফেলা হয়। পরে বালিশ চাপা দিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। তারপর তার পোশাক খুলে মৃতদেহের ছবি তুলে পাঠানো হয় ঝিনাইদহে আওয়ামি লিগের জেলা ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ ওরফে বাবুর ফোনে। এমনটাই বাংলাদেশ পুলিশ সূত্রের খবর।

ঢাকা পুলিশ সূত্রের খবর, ওই ছবি কামাল আহমেদ বাবুর ফোনে পাঠিয়েছিল শিমুল ভুঁইয়া। আনোয়ারুল খুনে একটা বড়ো ভূমিকা ছিল শিমুলের। সেকথা সে আদালতে স্বীকারও করেছে। ছবিটি কেন কামালের কাছে পাঠানো হয়েছিল, সেই বিষয়ে তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, এখানে দুটি বিষয় থাকতে পারে। প্রথমত, খুনিরা হয়তো চেয়েছিল আনোয়ারুল হত্যাকাণ্ডকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থাপন করতে। দ্বিতীয়ত, ঝিনাইদহ-যশোর- খুলনা অঞ্চলে আওয়ামি লিগের প্রভাবশালী নেতারা এই খুনের বিষয়ে অবগত থাকতে পারেন। এর কারণ হিসেবে সংবাদসূত্র বলছে, শিমুল ভুঁইয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজী কামালের বাইরেও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামি লিগের আরও এক নেতার নাম জানা গিয়েছে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, নিউটাউনের আবাসনে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার মাংসের টুকরোগুলো মানুষের। তবে সেটি এমপি আনারেরই কিনা সেই সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ডিএনএ পরীক্ষার পরেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে জানা গিয়েছে, হত্যার পর টুকরো টুকরো করা হয় এমপি আনারের নিথর দেহ। এরপর মাংসের টুকরো ফেলা হয় ফ্ল্যাটের কমোডের ভিতর এবং পার্শ্ববর্তী ভাঙড়ের বাগজোলা খালে ফেলা হয় হাড়গুলো। গত ৯ জুন সেই হাড় উদ্ধার করে ফরেন্সিক তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এমপি হত্যায় জড়িত বাংলাদেশে আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে কলকাতা পুলিশের একটি দল ঢাকা যাচ্ছে বলেও খবর। □

কাশ্মীরে তীর্থযাত্রীদের ওপর জঙ্গি হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীর উপত্যকায় ২০২৪-লোকসভা নির্বাচন ঘিরে বড়ো মাপের অশান্তির ঘটনা না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথের দিনই গত ৯ জুন (রবিবার)



জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটল জম্মু-কাশ্মীরে। এই দিন রিয়াসি জেলার একটি মন্দির থেকে বাসে করে পুণ্যার্থীরা যখন ফিরছিলেন, তখন বাসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। তাতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পনি এলাকার টেরিয়াথ গ্রামের কাছে একটি খাদে পড়ে যায়। এই সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় অন্ততপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। দ্রুততার সঙ্গে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি শিবখোড়া মন্দির থেকে কাটরার দিকে যাচ্ছিল। তার মাঝপথেই এই হামলা হয়। জঙ্গিদের একটি দল বাসটিকে লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালায়। জঙ্গিরা রাজৌরি, পুঞ্চ ও রিয়াসি জেলার পাহাড়ি এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর। তাদের সন্ধানে চিরুনি তল্লাশি চলছে।

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয় যে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে ১৯ জুন পর্যন্ত। সন্ত্রাসের অভিযোগ ছিল ভোটের আগে থেকেই। গত ৪ জুন ভোটের ফলপ্রকাশের দিন থেকেই ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের শিকার বিজেপির নেতা, কর্মী, সমর্থকরা। তাই রাজ্যের বিজেপি নেতা, কর্মী, সমর্থকদের নিরাপত্তার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই মামলা গ্রহণের আর্জি জানানো হয়। গত ১০ জুন মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

‘বিকাশ ভবন অভিযান’ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ‘যোগ্য’ শিক্ষকরা পুলিশের হাতে প্রহৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৭ জুন এসএসসি-র ২০১৬ সালে নিযুক্ত শিক্ষকদের স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি), বিকাশ ভবন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অভিযান ঘিরে সল্টলেকের করুণাময়ীতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কয়েক হাজার শিক্ষক করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ডের কাছে এদিন জড়ো হয়েছিলেন। মিছিল করে এসএসসি অফিসের দিকে এগোতেই তাঁরা পুলিশের ব্যারিকেডের সম্মুখীন হন। জমায়েত ভাঙতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর লাঠিচার্জ করতে থাকে পুলিশ। অভিযোগ, বেধড়ক লাঠিচার্জের পর সাত জন শিক্ষককে আটক করে পুলিশ। পরে অবশ্য শিক্ষকদের কয়েক জন প্রতিনিধিকে এসএসসি দপ্তর, বিকাশ ভবন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদে যাওয়ার অনুমতি দেয় পুলিশ। এদিন ‘যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ২০১৬ অধিকার মঞ্চ’-এর তরফে বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, ‘আমরা এসএসসি অফিসে গিয়ে দাবি করেছি, আগামী ১৬ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে যোগ্য ও অযোগ্যদের মধ্যে বিভাজনের তালিকা দিতে হবে’। তিনি আরও জানান— তাঁরা বিকাশ ভবন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদে গিয়ে দাবি করেছেন যে ২০১৬ সালে নিযুক্ত অযোগ্য শিক্ষকেরা যাতে মুচলেকা দেন, সে বিষয়ে স্কুলশিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিতে হবে। তাঁর দাবি, ‘সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, যাদের নিয়োগ অবৈধ বলে অভিযোগ, কেবল তাদেরই মুচলেকা দিতে হবে। যোগ্যদের কোনো মুচলেকা দিতে হবে না’। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল তারিখে ২০১৬-র এসএসসি-র ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের পুরো প্যানেল বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্ট পরে হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। আগামী ১৬ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।